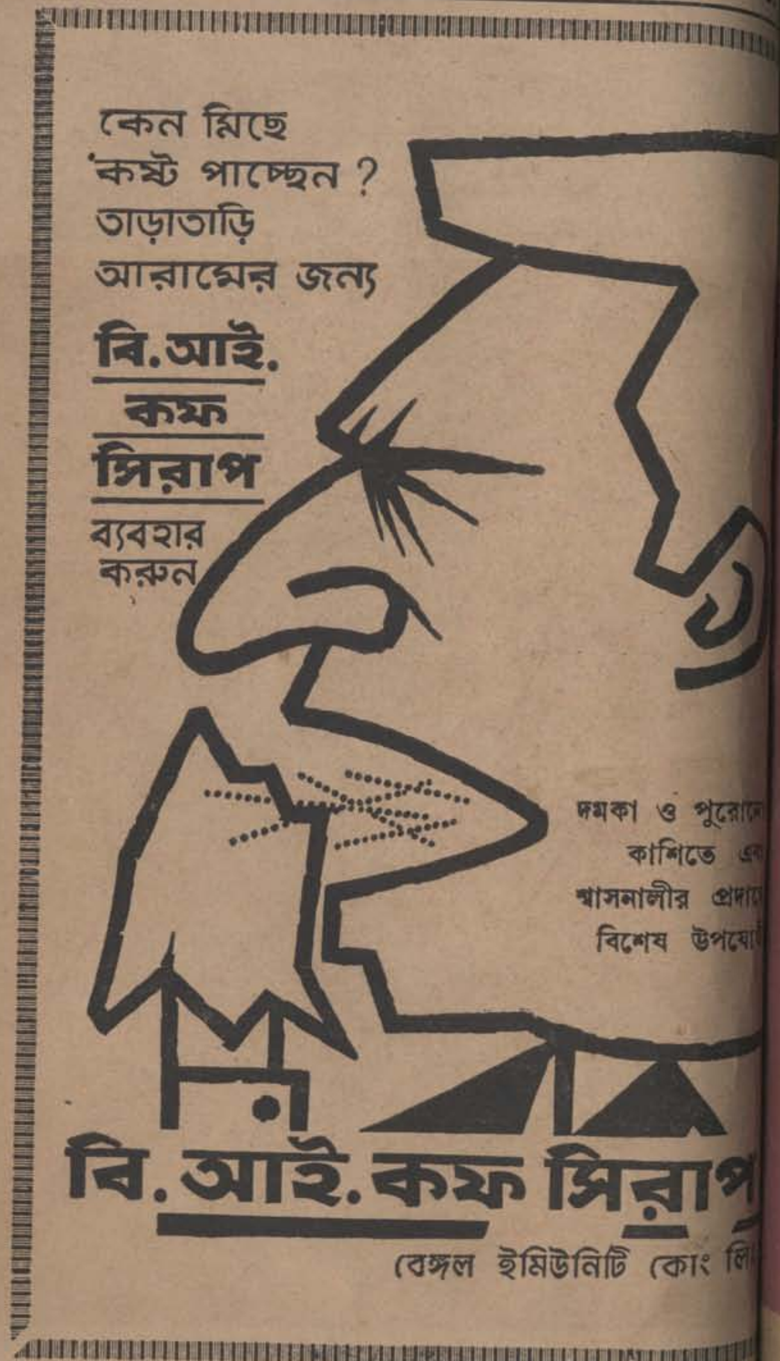


পরিচয়

ভাদ্র। ১৩৬৮

সম্পাদক
গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

ভাদ্র সূচীপত্র ১৩৬৮

সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিণ্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

আধুনিক পরিবারে অভিনব সার্ফ



'আমাদের আজকের জীবনে...'

বোম্বের গৃহিণী প্রেমা সুন্দরজী বলেন

'আমাদের আধুনিক এই জীবনযাত্রায় মনে হয় রোজই নতুন জিনিষ চাই, আর কালকের চেয়ে আরও ভাল জিনিষ চাই'—বোম্বের ওয়াল-কেশ্বর রোডের শ্রীমতী প্রেমা জি. সুন্দরজীর অভিমত। 'এই সার্ফের কথাই ধরুন। আমার বাড়ীর সব কাপড় চোপড়ই—সার্ট, প্যাণ্ট, শাড়ী, ব্লাউজ, তোয়ালে চাদর সবই সার্ফে কেচে চমৎকার ফরসা হয়!'

সার্ফে সহজেই কাপড় ধব্‌ধবে ফরসা হবে। আজ নিজেই একবারটি পরখ করে দেখুন!

সার্ফে কাপড়জামা

সবচেয়ে ফরসা করে কাচে



হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী



'এমন ছেলেকে সামলাতে হলে আপনার কাজের আর অন্ত নেই ···! বিশেষ করে ছেলেমেয়েদের যদি ফিট্‌ফাট রাখতে চান, তা'হলে কাপড় কাচাটাতো লেগেই আছে।'

'সানলাইটে কাচি, তাই রক্ষে! শুধু পেরে উঠছি সানলাইটের দেদার ফেনায় কাচাটা খুবই সহজ বলে। কেবল এমন খাঁটি সাবানেই এত ভাল কাপড় কাচা যায় আর তাও কোন কষ্ট না করে।'

৫৪ নং ফ্ল্যাট, ভগতসিং মার্কেট, নয়া দিল্লীর শ্রীমতী ওয়াদওয়ানি বলেন, 'কাপড়কাচায় সানলাইটের মতো এত ভাল সাবান আর হয় না।'

সানলাইট



পরিচয়

বর্ষ ৩১ ; সংখ্যা ২

ভাদ্র, ১৮৮৩ ; ১৩৬৮

টমাস মানের শেষ প্রবন্ধ

নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

কেমন করে বাঁচতে হবে, সভ্যতার এই মূল প্রশ্ন তো আসলে সমাজপটে ব্যক্তিমানুষের স্থান নির্ধারণেরই ব্যাপার। সমাজের বহুবিধ সম্বন্ধেই তো মানুষ বাঁচে, নিজের সঙ্গে অপরের, পরিবারের, গোষ্ঠী এবং বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধপাতের সমস্যাই তো সভ্য মানুষের সকল প্রকার জিজ্ঞাসার মূল। এই সমস্যাকে আয়ত্ত করার চেষ্টার পরিণাম বিভিন্ন মানবিক সম্পর্ক তথা সমগ্র অস্তিত্বের শৃংখলা, প্যাটার্ন নিরূপণে।

ঐতিহাসিক নিয়মেই প্রতিটি যুগে বাস্তব জীবনের সঙ্গে পুরনো প্যাটার্নের বিরোধ দেখা দেয়, কারণ তাতে মানবচৈতন্যের বিকাশের সম্ভাবনা রুদ্ধ হয়ে আসে, নিছক অভ্যাসের জের টানায় মনের মুক্তি মিলতে পারে না। তাই পুরনো প্যাটার্ন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসায়, পুনর্বিচারে, আত্মোপলব্ধির সংঘাতজর্জরিত প্রয়াসে জীবনের নতুন ছক নির্মাণ। ভাঙাগড়ায়, অস্তিত্বের নতুন তাৎপর্য অন্বেষণে—সভ্যতার এই জটিল প্রক্রিয়ায়ই ব্যক্তিস্বরূপ তার যথার্থ প্রতিষ্ঠা-ভূমি খুঁজে পায়। দেশকালের সম্পর্কবিহীন তথাকথিত নিরংকুশ স্বাধীন মানুষের বাসা শুধু উদ্ভট, উৎকেন্দ্রিক কল্পনায়।

শিল্পসাহিত্যের স্তরে সভ্যতার এই প্রাথমিক প্রক্রিয়াটি অবশ্যই জটিল হয়ে ওঠে। বিশেষত আধুনিক যুগের বহুধাবিভক্ত জীবনে অনিশ্চয়তাকেই সত্য এবং সমাজ ও ব্যক্তির গূঢ় ঐক্যের সমস্ত আবেগ প্রত্যয়কে মিথ্যা বলে মনে হতে পারে। জীর্ণ সমাজের দেউলেপনায় কোনও ভবিষ্যতের স্থিরতায়

শিল্পী যদি মনকে বাঁধতে না পারেন, তবে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের অধিকার আমাদের থাকে কিনা, এ প্রশ্ন অনেকের কণ্ঠে শোনা যায়। সমাজ ধ্বসে পড়ছে, মানুষকে ধরে রাখার কেন্দ্রাতিগ শক্তি তার নেই, আধুনিক সভ্যতার পঙ্গুদশায় ইয়েট্‌স্‌-এর সেই বিখ্যাত মর্মোৎসারিত আর্তিই কি অনিবার্য নয়—

Mere anarchy is loosed upon the world,
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
The ceremony of innocence is drowned ;
The best lack all conviction……

ইয়েট্‌স্‌ অবশ্য এখানেই থামেন নি, বেথেলহেম্‌-এ শিশুটির আবির্ভাবের মতোই আমাদের ক্ষয়দশায় আর একটি দিব্য প্রকাশের স্বপ্ন দেখেছেন, কিন্তু অনেক শিল্পীর কাছেই তো সেটা অর্থহীন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই তো আমরা দেখেছি, কোনও কোনও কবি সাহিত্যিক সভ্যতা সম্বন্ধে আস্থা খুইয়ে অসম্বদ্ধতাকেই মেনে নিয়েছেন অমোঘ দুর্বোধ্য অদৃষ্টরূপে। তাঁদের মতে, গ্যেটের আলোকপিপাসা এখন অসম্ভব, একটি পথই শুধু আছে, সে পথ সূর্যের নয়, হিমশীতল অন্তহীন অন্ধকারের, যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপে শুধু হীন মৃত্যুর অশুভ চীৎকারই বুকে বাজে। জীবন বিচ্ছিন্ন কলাকৈবল্যের আত্মরতিতেই কেউ কেউ মুক্তি খুঁজেছিলেন। কিন্তু ক্ষণকালের মুক্তিও মেলে নি, আত্মক্ষয়ের গ্লানিই শুধু কপালে জুটেছে। প্রচণ্ড আক্রোশে নিষ্ফলতার ক্ষোভে শত্রু ভেবেই জীবনকে তাঁরা পরিহার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এ রামের মতোই বৈরী, শিল্পের মিনারকে নিশ্ছিদ্র করে তোলার সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে কঠিন প্রতিশোধ নিয়েছে। কেউ কেউ তো অবশেষে এই দ্বন্দ্ব সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যাই করেছিলেন।

মহৎ শিল্পীদের উদাহরণ থেকেই জানি, জীবনের সমগ্রতার আত্তিক বোধেই সমস্ত দ্বিধা সংশয় দ্বন্দ্বের যথার্থ রূপ ধরা পড়ে। সুস্পষ্ট সমাধান না মিলুক, আর সেটা অসুস্থ ভারসাম্যহীন সমাজে হয়তো খুব প্রত্যাশিতও নয়, কেমন করে বাঁচতে হবে এই প্রশ্নের মানবিক তাগিদই আমাদের আর্ত করে। সেই প্রশ্নের সততায়ই একটি রুগ্ন মানুষের প্রবল যন্ত্রণা আমাদের সমগ্র জীবনেরই রূপক হতে পারে। সাহিত্যে বিশ্বাসেরও সরলীকরণ চলে না।

টমাস মানের গল্পে উপন্যাসে অসুস্থ মানুষকেই দেখেছি বিভিন্ন চেহারায় এবং পটভূমিতে: বাইরে জীবনের সচল প্রবাহ, কিন্তু ভেতরে মৃত্যুর নিষ্ঠুর জীবাণু নিঃশব্দে ফুসফুস কুরে কুরে ক্ষয় করে চলেছে কি দিন, কি রাত্রিতে। অথচ অদৃষ্টের ট্র্যাজিক বিড়ম্বনায় সুস্থ মানুষদের তুলনায় জীবনের বোধ এত তীক্ষ্ণ, উৎসুক যে বাইরের হাসি গান স্বাস্থ্যপুষ্ট পেশীর চেকনাই তার সমস্ত স্নায়ুতে রক্তে চেতনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে দীপকের আগুন জ্বালায়। ভাবতে অবাক লাগে, এই যন্ত্রণা ডি. এইচ্. লরেন্সের মতো মমতাবান শিল্পীকেও বিমুখ করে তুলেছিল। নিজস্ব মেজাজ রুচিতে মেলেনি বলেই লরেন্স টমাস মানের প্রতি কিছুটা অবিচারই করেন। ফ্লোবেয়ারের অস্বাস্থ্যবিলাসের সঙ্গে তুলনায়ই বোঝা যায়, মানের ব্যাধি-যন্ত্রণার অন্তর্লীন তাৎপর্য বোঝার ধৈর্য তাঁর হয়নি। তবে ১৯১৩ সালে এই জার্মান শিল্পীর ওপর তরুণ লরেন্সের প্রবন্ধটি লেখার সময় তাঁর রচনাবলীর অল্প কয়েকটিই প্রকাশিত হয়েছিল। এখন এই লেখকের মহত্ত্ব আমাদের কাছে অনেকটা স্পষ্ট।

মানের আশেনবাথ্, স্পিজেল, টোনিও ক্রোগার, হান্‌স্‌ ক্যাস্টর্‌প্‌ প্রভৃতি চরিত্রগুলি সকলেই অসুস্থ। একালের আত্মসচেতন মানুষের যে ব্যাধির যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার নেই, তাকে তিলে তিলে শরীরে ও মনে পুড়তেই হবে। কিন্তু ব্যাধি নিয়ে তাৎপর্যহীন নিঃসঙ্গতার বিলাস মান করেন নি, তাঁর ব্যাধির বিষমন্থনে জীবনের শুদ্ধতার অন্বেষণই লক্ষণীয়। টোনিও ক্রোগার গল্পটিই ধরা যাক। টোনিও বিশিষ্ট অভিজাত পরিবারেই জন্মেছিল, কিন্তু তা ক্রমে ক্রমে ধ্বংস হল। সে ভেসে বেড়াতে লাগল জীবনের এক তট থেকে আর এক তটে, গার্হস্থ্যজীবনের সুখশান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারল না। শিল্পের চর্চায় টোনিও তার স্বাস্থ্য শক্তি সব খোয়ায়, তার পরিবর্তে পায় জীবনকে দেখার, বোঝার প্রজ্ঞাদৃষ্টি। কিন্তু এর ফলে অপরদিকে দুঃসহ যন্ত্রণার পাকে পাকে জড়িয়ে যায় তার সমস্ত অস্তিত্ব। ঐ প্রজ্ঞার জগৎ থেকে তো তাকে মাঝে মাঝে নামতেই হয়, রক্ত মাংসের জীবনের দাবী তখন প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। হৃদয়ে অপর একটি হৃদয়ের ভালোবাসার জ্বালাহর স্পর্শ নেই, যাকে অপরের জীবন পর্যবেক্ষণ করতে হয় তার ভালোবাসার অবকাশ কোথায়! তাই নিছক দেহের ক্ষুধা মেটাবার জন্যেই তাকে লালসার নরকে আশ্রয় নিতে হয়, তারপর সমস্ত শরীর মনে সেই ব্যভিচারের বিষজ্বালা। একদিকে শুদ্ধতার মানবিক আগ্রহ, অপরদিকে এই অসুস্থ জীবনের অসঙ্গতি,

এই টানাপোড়েনই কি শিল্পীর অদৃষ্ট ? জীবনের রূপ ফোটাতে গিয়ে নিজের জীবনকে পোড়াতে হবে তার মতো অভিশাপ আর কি আছে !

আমরা দেখি, টোনিও ক্রোগারের চৈতন্যে এই দীপকের জ্বালা এসে মেশে মল্লারের অশ্রুতে। তার মরুভূমির মতো তাপদগ্ধ শুষ্কজীবনে জলের কান্না যে কিভাবে লুকিয়ে ছিল, বিদেশে একদা যারা বাল্যবন্ধু এবং বান্ধবী ছিল, তাদের যৌবনোদ্ধত শরীর মনের উচ্ছ্বাস দেখে বুঝতে পারে। ওদের হাসি গান নাচে হৈহুল্লোড়ে অসংকুচিত প্রবৃত্তির আদিম স্বাস্থ্য প্রায় চোরের মতো আড়ালে দাঁড়িয়ে টোনিও দেখে ভাবে, জ্ঞানের সমস্ত বিড়ম্বনা এবং সৃষ্টির যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে ঐ সহজ জীবনকে যদি ধরা যেত, ঐ আনন্দোচ্ছল তরুণীটি যদি তার স্ত্রী হত, আর একটি সন্তান পেত, ঐ বন্ধুটির মতোই অমন সবল, স্বাস্থ্যদীপ্ত ! ওদের জান্তব সত্তায় মন নেই, তাই একটি তৃষ্ণার্ত মনের দীর্ঘশ্বাস এত কাছে থেকেও ওরা শুনতে পায় না। টোনিও ক্রোগারও নিজেকে উদ্ঘাটিত না করে আড়াল থেকেই তার ঘরে চলে যায়। শুধু বোঝে, জীবনের এই অসঙ্গতিতে সহজের প্রতি অন্তর্বাহী মানবিক আকর্ষণই একজন সাহিত্যজীবীকে কবি করে তোলে। এ যুগের খণ্ডিত অস্তিত্বের পটে আত্মসচেতনতার, বুদ্ধি এবং হৃদয়ের সেতুবন্ধনের জন্য এমন মর্মান্তিক ব্যাকুলতার রূপ সত্যি দুর্লভ।

এই প্রজ্ঞাদৃষ্টির পরিচয় নতুন করে পাওয়া গেল টমাস মানের শেষ প্রবন্ধাবলীর সংকলনে। সভ্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা এবং তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আস্থা যে কত গভীর ছিল এই শিল্পীর জাগ্রত মননে, প্রত্যেকটি প্রবন্ধেই সে প্রমাণ মেলে। শীলার, গ্যেটে, নীট্সে এবং চেখভ্-এর ওপর চারটি রচনাই মনন ও হৃদয়সংবেদ্যতার গভীরতায় আমাদের চৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ করে।

কাণ্টের দর্শনে প্রভাবিত হলেও শীলারের শিল্পীমন তাঁর দ্বৈতবাদে সায় দিতে পারে নি। কাণ্টের মতে, দৃশ্যমান সাধারণ আবেগ অনুভূতি এবং সর্বোচ্চ ন্যায়—মানুষ এই দুটো জগতের অধিবাসী। দৃশ্যমান জগতের কার্য-কারণশৃংখলায় সর্বোচ্চ ন্যায়ের হস্তক্ষেপের ফলেই মানুষের নৈতিক সত্তার উদ্ভব। কবির দৃষ্টি শুধু দৃশ্যমান জগতে নিবদ্ধ থাকে বলেই এই ন্যায়বিধৃত প্রকৃত সত্তা তার কাছে অপ্রকাশিতই থেকে যায়। কিন্তু শিল্পীর পক্ষে

মানুষের সত্তার এমন দ্বিখণ্ডীকরণ গ্রহণীয় নয়, সমস্ত দ্বন্দ্ব অসঙ্গতিতেই মানুষ ও জগতকে ঐক্যের সমগ্রতায় বাঁধাই তো তার অন্বিষ্ট। স্বভাবতই আধুনিক সভ্যতার বিশৃংখলা শীলারকে ভাবিয়েছিল, সৌন্দর্যের সাধনায়ই তিনি জীবনের ভারসাম্য খুঁজেছিলেন। সৌন্দর্যের প্রাণই তো সামঞ্জস্য : প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, ইন্দ্রিয়জবোধ আর নীতিচেতনা, ইন্দ্রিয়নির্ভর দেশকালে সীমিত, অসম্পূর্ণ অস্তিত্ব এবং অনন্ত আকাশ-সন্ধানী বিশুদ্ধ সত্তা—শুধু শিল্পীর সৌন্দর্যের এষণায়ই তো এই দ্বৈত এক বিচিত্র সমন্বয়ে মেলে। শীলারের 'দি আর্টিস্ট্স্' কবিতাটিতে শিল্পের সেই সমন্বয়ের প্রশস্তির সূত্রে এই সামঞ্জস্যবোধই প্রকাশিত হয় স্তোত্রের সারল্য এবং গাম্ভীর্যে।

সৌন্দর্যতত্ত্বের আলোচনায় এবং শিল্পসৃষ্টিতে এই পূর্ণতাকে শীলার অন্বেষণ করেছিলেন কি প্রাণান্তকর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠায়, সহৃদয় বিশ্লেষণে টমাস মান আমাদের দেখান। ব্যাধিজর্জর শরীরের সমস্ত স্নায়ু বারবার অবসন্ন হয়ে আসে, মাঝে মাঝে উত্তেজক নেশায় নিজেকে চাঙ্গা করে নিতে হয়, তারপরেই গভীর অবসাদে শরীর ভেঙ্গে পড়ে। তবু জীবনের শিল্পরূপায়ণ বিষয়ে শীলারের মন আশ্চর্য সজীব, সচল। 'দি মেড্ অফ অর্লিন্স্'-এর ভূমিকায় তিনি বিষয় ও তার রূপারোপ সম্বন্ধে লেখেন, বিন্যাসের কোনও নির্দিষ্ট ধারণায় শিল্পীকে আবদ্ধ থাকলে চলবে না. প্রতিটি নতুন বিষয়বস্তুর জন্যে সাহসের সঙ্গেই নতুন আধার আবিষ্কার করতে হবে, রচনারীতি নিরূপিত হবে বিষয়বস্তু অনুসারেই। যে-কালে রোমান্টিক মত্ততার লক্ষণ বেশ ভালোভাবেই দেখা দিতে আরম্ভ করেছে, সে-সময় বিষয়ের এই চেতনা লক্ষণীয়। মান ঠিকই বলেন, শীলারের 'আকাশনীল' আদর্শবাদের গতানুগতিক প্রসিদ্ধি সত্ত্বেও আমরা বুঝি, মহৎ শিল্পী হিসেবেই তাঁকে, প্রত্যক্ষ-জীবনের দিকে তাকাতে হয়েছিল। মান-এর মতে, 'রিয়ালিজ্ম্' শীলারের মহত্ত্বের একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ, আর 'রিয়ালিজ্ম্' হচ্ছে জীবনের সঙ্গে মোকাবেলা করার শক্তি, সাহস এবং সংকল্পের একাগ্রতা। এখানেই হোয়েল্ডারলিন্, যিনি তাঁকে কিছুকাল অভিভাবকস্থানীয় বলে মনে করতেন, তাঁর সঙ্গে এই শিল্পীর কবিস্বভাবের পার্থক্য। বাস্তবজীবনের সংঘাতে হোয়েল্ডারলিন্ ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন, আত্মকেন্দ্রিক আবেগের তীব্রতায় আশ্রয় খোঁজেন, যাকে মান সঙ্গত কারণেই 'উন্মত্ততা' আখ্যা দেন। শীলার

নিজেই তো হোয়েল্ডারলিন্ সম্বন্ধে বলেছেন, এই কবির জীবন নিজের মধ্যেই গুটিয়ে গেছে, সমসাময়িক জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনের সেতুবন্ধনের ক্ষমতা তাঁর নেই।

শীলার যখন উনিশ বছর বয়সে মিলিটারি অ্যাকাডেমির ছাত্র, তখন কর্তৃপক্ষের নজর এড়িয়ে অতি সংগোপনে তাঁর প্রথম নাটক 'দি রবার্স্' রচনা করেন। তরুণ লেখকের যন্ত্রণা আর অপমানবোধের প্রবল আবেগে সে-যুগের সমস্ত অত্যাচার আর মেকি সমাজের ক্লেদাক্ত দিকগুলো এই রচনায় বলিষ্ঠ রূপ পায়। পরবর্তী কালের অন্যতম প্রধান রচনা 'ডন্ কার্লোস্'-এর কাব্যগৌরব পনরো বছর বয়সেই তাঁর মনে কিভাবে ভাষা সম্বন্ধে প্রবল আবেগ উদ্দীপিত করে, মান তার প্রাণবন্ত বর্ণনা দিয়েছেন। একই সঙ্গে আত্মবিক্রীত সমাজের প্রতি কঠিন বিদ্রূপের ধিক্কার আর মহত্ত্বের তৃষ্ণা এই নাটকে প্রকাশিত। মান-এর মতে, শীলার এমন এক কবি যিনি স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে ঘৃণা জাগানোর সঙ্গে সঙ্গেই মহত্ত্বের আবেগে আমাদের চোখ দিয়ে জল ঝরাতে পারেন।

কাব্যের গুণকে ক্ষুণ্ণ না করে কিভাবে জনসাধারণের হৃদয়কে স্পর্শ করা যায়, একটি সমালোচনায় সে সম্বন্ধে শীলারের উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায়। তিনি বলেন, জনপ্রিয়তার লক্ষ্য আসলে শিল্পকর্মকে সহজ করে তোলার পরিবর্তে কঠিনই করে এবং সে দুরূহ পরীক্ষায় সাফল্য প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। জনসাধারণের হৃদয়ে বিভিন্ন আবেগের স্রোত প্রকাশের পথ খুঁজে মরে, যে কবি যথাযথ প্রকাশের সঙ্গেই তাদের শুদ্ধ, মহৎ রূপ দিতে পারেন, তিনিই জনসাধারণের আবেগ অনুভূতির প্রতিভূ। 'হ্বিলহেল্ম টেল' নাটকে শীলার নিজেই শিল্পকর্মের এই দুরূহতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ফরাসী বিপ্লবের রক্তাক্ত পরিণামে তিনি বিতৃষ্ণা বোধ করেছিলেন, কিন্তু জাতীয়তা ও স্বাধীনতার চেতনার ঐক্যসূত্র হিসেবে পরোক্ষভাবে তা তাঁর আবেগের স্বাভাবিক পটভূমি ছিল। 'হ্বিলহেল্ম টেল'-এ তার ছায়াপাত স্পষ্ট বলে সেযুগে কেউ কেউ রচনাটিকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারেন নি, আর হিটলারি আমলে তো সেটি নিষিদ্ধই হয়।

শীলারের কবিকৃতির বিশ্লেষণের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর সঙ্গে গ্যেটের বন্ধুত্বের যে বিবরণ মান-এর কাছ থেকে পাই তাও কম আকর্ষণীয় নয়। এই বন্ধুত্ব সম্পর্কে একথা সুবিদিত যে গ্যেটের মহত্ত্ব স্বীকার করে নিলেও এবং তাঁর

ভালোবাসার প্রবল আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও নিজের স্বাতন্ত্র্য বিষয়ে শীলার সব সময়েই সচেতন ছিলেন। সেজন্য দুঃখও তাঁকে কম পেতে হয় নি। এই রুগ্ন লোকটির প্রতি বিপুল জীবনীশক্তির অধিকারী গ্যেটের হয়তো একটু অনুকম্পাই ছিল। শীলারের তুলনায় তাঁর ব্যবহার ছিল অপেক্ষাকৃত নিরুত্তাপ। ঠিক মতো প্রতিদান না পেয়ে অসুস্থ মানুষটি ছটফট করেছেন, ভেঙে পড়েছেন। তবে এই সম্পর্ক তাঁর নিজের দিক থেকেও যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, বন্ধুর মৃত্যুর পর গ্যেটে অকুণ্ঠচিত্তেই স্বীকার করেন।

মৃত্যুর কিছু পূর্বে লেখা 'ডেমিট্রিউস' নাটকে বিশ্বাসভঙ্গ এবং মিথ্যাচারের ভয়াবহতা এমন তীব্রতায় প্রকাশিত যে টমাস্ মানের মনে হয়, শীলারের নিজস্ব রচনারীতি অপেক্ষা এর সঙ্গে যেন ক্লাইস্টের সাদৃশ্যই বেশি। ক্লাইস্টের মেজাজেই তো এই বীভৎস নিষ্ঠুরতা খাপ খায়। রচনাটি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে মান বলেন, নিজের ওপর আস্থা এবং মানবিকতায় বিশ্বাস যে শিল্পীর কাছে এত মূল্যবান, তিনিই যখন প্রবঞ্চনা ও বিশ্বাসহানির এই তীক্ষ্ণ নাটক লেখেন, তখন বুঝতে হবে, এর মধ্যে নিশ্চয়ই ভয়াবহ কিছু আছে। আর নাটকটির রচয়িতা তো ঐ বিপজ্জনক চেতনা এবং তৎসঞ্জাত দ্বন্দ্বের নিষ্ঠুরতার বিষয়টিকে আয়ত্ত করতে গিয়ে জীবনের শেষ শক্তিটুকুকে ব্যয় করে মৃত্যুর কাছেই আত্মসমর্পণ করেন। প্রবন্ধের লেখক অবশ্য প্রসঙ্গটিকে ছুঁয়ে যান মাত্র, এই নাটকের পশ্চাতে কবির কোন্ আত্মিক সংকট তথা সভ্যতার সমস্যা ছিল, সে বিষয়ে আলোকপাত করেন না বলে আমাদের আক্ষেপই থেকে যায়।

তবে এর পরে যে অকল্পনীয় কষ্টে, নিজের অসুস্থ শরীরকে প্রায় ধ্বংস করে শীলার সাহিত্যকর্ম করে গেছেন, তার উল্লেখ অবশ্যই আমাদের হৃদয় স্পর্শ না করে পারে না। 'ডেমিট্রিউস' রচনার অল্প কিছুকাল পরেই কবির মৃত্যু হয়, তারপর শবব্যবচ্ছেদে দেখা গেল, বাঁদিকের ফুসফুসটি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট ; হৃৎপিণ্ড, প্লীহা, মূত্রাশয় শরীরের প্রায় প্রত্যেকটি অংশ গুরুতর ভাবে জখম। তাঁর ক্ষয়প্রাপ্ত স্নায়ুগুলোয় যে নিদারুণ পীড়ন গেছে, এই বিবরণ থেকেই অনুমান করতে পারি।

শেষ বিচারেই দেখা যায়, এই ব্যক্তিটি নিজের ব্যাধি এবং সেই সঙ্গে সভ্যতার অসুস্থতাকে অতিক্রম করার চেষ্টায়ই রত ছিলেন। তাই গভীর

শ্রদ্ধায় একালের আর এক জীবনানুসন্ধিৎসু শিল্পীকে বলতে শুনি, যিনি নিজের ব্যাধিকে জয় করেছিলেন, তাঁর কণ্ঠস্বরে কান দিলে আমাদের এই ব্যাধিগ্রস্ত যুগের চিকিৎসকরূপেই আমরা তাঁকে পেতে পারি।

বিশ্বাসহীনতার মতো মানবতার এত বড় শত্রু আর নেই, মানবসভ্যতার ঐতিহ্যে এই আস্তিক্যবোধই শীলারের দান। তাঁর 'হ্বালেনস্টাইন' নাটকে বিশ্বাসঘাতক নায়কের মুখেই শুনি :

True faith, I tell you,
Must ever be the dearest friend of man ;
His nature prompts him to avenge its betrayal.

সমসাময়িক কালের ক্ষুদ্র চিন্তা, উৎপীড়ন, দুঃস্থতার গ্লানি মনকে পঙ্গু করলেও উচ্চতর এবং সর্বজনীন মানবিক বিষয়ের অভিনিবেশে সেই সীমাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করতে হবে, শীলারের এই প্রত্যয়কে আমরা যেন নন্দনতত্ত্বের বিলাস বা জীবন থেকে পলায়ন না ভাবি, মান আমাদের সতর্ক করেছেন : এই প্রত্যয় তো জীবনের গভীর আগ্রহ থেকেই উৎসারিত।

লেখক নিজেও তো রোগজীর্ণ দেহের বোঝা বহন করেছেন আজীবন, প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মানুষের শরীর ও আত্মার শোচনীয় অপমৃত্যু দেখেছেন, তাই তো তিনি তাঁর স্বদেশের শিল্পীর ঔদার্য ও শুদ্ধ মনুষ্যত্বের অভীপ্সাকে এমন মূল্য দিতে পারেন। উপসংহারে তাঁর বিষণ্ণগম্ভীর আবেগকম্পিত কণ্ঠস্বর গভীর মানবিক উৎকণ্ঠায় আমাদের অভিভূত করে: পর পর দুটো মহাযুদ্ধে হিংস্র পাশবিকতায় লুণ্ঠন রক্তমোক্ষণে সভ্যতা ক্ষতবিক্ষত, বর্তমান যুদ্ধোত্তর বিশৃংখল অসুস্থ সমাজে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিবারণের নিরাপত্তা কোথায়, যে-যুদ্ধে সমস্ত কিছুরই ধ্বংস অনিবার্য। মনন এবং নীতিবোধের এই ব্যাপক অধঃপতনের যুগেই তো শীলারের সার্বজনীন শুভবোধের এত বেশি প্রয়োজন : আমরা যেন তাঁর মানবিকতার মহত্ত্বের কিছুটাও অনুভব করি, সৌন্দর্য, সত্য, আত্মশ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর পৌরুষের সংকল্পের অন্তত কিছু অংশও যেন আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে অগস্টের দুপুরে জার্মানির ফ্রাংকফুর্ট শহরে এক অষ্টাদশবর্ষীয়া তরুণী যে সন্তানের জন্ম দেন, তাকে এত নীল এবং নির্জীব দেখাচ্ছিল যে প্রথমে মনে হয়েছিল, এই পৃথিবীর আলোবাতাসের স্বাদ

পরিপূর্ণভাবে নেবার আগেই ওকে মাতৃজঠর থেকে সোজাসুজি কবরে ঠাঁই নিতে হবে। কিছুক্ষণ পরেই নবজাত শিশুটির ঠাকুমার চীৎকার শোনা গেল : এলিজাবেথ, সে বেঁচে আছে! এ যেন শুধু ঘরের সংকীর্ণ সীমায় একটি নারীর কাছে অপর এক নারীর আশ্বাসমাত্র নয়, সমস্ত পৃথিবীর কাছে দুর্মর প্রাণশক্তির রক্তোচ্ছ্বাসেরই ঘোষণা। এই মর্তে যতদিন জীবন এবং প্রেমের অস্তিত্ব থাকবে, নিজের যন্ত্রণায় অবসন্ন না হয়ে জীবন নিজেকে ভালোবাসবে, বিতৃষ্ণায় নিজেকেই নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে না রাখবে, ততদিন এখানে সেই বৃদ্ধা নারীর মুখোচ্চারিত অপরিমেয় প্রাণের আবির্ভাব-বার্তা ঘোষিত হবে : সে বেঁচে আছে!

এই গৌরচন্দ্রিকায়ই গ্যেটের জীবন ও শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধটির আরম্ভ। সত্যি, গ্যেটের সম্বন্ধে প্রথমেই তো মনে হয়, একটি ব্যক্তির আধারেই জীবনের এমন সম্ভাবনাশক্তি ও বিকাশের দৃষ্টান্ত দুর্লভ। অক্ষয়বটের শক্তি নিয়েই এই পুরুষটি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, নিজের বিপজ্জনক ব্যাধি সত্ত্বেও বেড়ে উঠেছিলেন মাটি আর আকাশের সমস্ত দানকে আত্মসাৎ করে। তাঁর জীবনের আশেপাশে অনেক ঐতিহাসিক সংঘাত ও পরিবর্তনের ঢেউ আছড়ে পড়েছে : সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ, আমেরিকার স্বাধীনতাসংগ্রাম, ফরাসীবিপ্লব, পটভূমিগত সমস্ত সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন বহন করে উনবিংশ শতাব্দীর আবির্ভাব। এই ঘাতপ্রতিঘাতের মাঝখানে তাঁর হৃদয়মন ছিল চলিষ্ণু, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সদা উৎসুক। জীবনের শেষ চিঠিতে তিনি বন্ধুকে জানান, স্বকীয় প্রবণতা তথা চারিত্র্যকে ক্ষুণ্ণ না করে সমস্ত কিছুকে গ্রহণ করাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ প্রতিভা।

এই আশ্চর্য প্রাণময়তার ইতিহাসকেই মান তুলে ধরেছেন। গ্যেটে-সম্পর্কিত যে কোনও আলোচনার প্রসঙ্গেই এলিয়টের বিনয়বাচন মনে পড়ে, এই শক্তিধর পুরুষের জীবন ও কর্ম এত বিচিত্র ও বিস্তৃত এবং বহুল আলোচিত যে তাঁর সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলা দুঃসাধ্য। মান-এর প্রবন্ধেও নতুন কিছু নেই। কিন্তু আলোচনার প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ মনের নির্মলতা, সার্বভৌম উদার মানবিক দৃষ্টি এবং নির্মোহ আবেগ আমাদের সমস্ত মনকে টেনে রাখে।

গ্যেটের ব্যক্তিস্বরূপের শক্তির সঙ্গে তাঁর সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করতেও মানের ভুল হয় না। একদিকে তিনি যেমন মননের আকাশকে উন্মুক্ত

রেখেছিলেন, অপরদিকে তেমনি কোনও কোনও ক্ষেত্রে জনসাধারণের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে বাধাও দিয়েছেন। গণতান্ত্রিক জাতীয়তার আবেগকে ব্যাহত করার দিকেই তিনি ঝোঁকেন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে বিরূপতা প্রকাশ করেন, মুষ্টিমেয়দের শ্রেণীই সকল শুভবুদ্ধির অধিকারী এ বিশ্বাসে তাঁকে নিশ্চিত হতে দেখা যায়। বিপ্লবের শুদ্ধিকরণের দিকে মানুষের আগ্রহে তাঁর আস্থা ছিল না। তাঁর মানবিকতায় এই বিপরীতমুখী টানের ফলে অনেক সময়ই তিনি স্ববিরোধী মতামত প্রকাশ করেন।

লেখককে অনুসরণ করে এই দ্বন্দ্বের সীমায়ই গ্যেটের মহত্ত্ব আমরা ভালো করে বুঝি। মহৎশিল্পীদের শিল্পসাধনা তো একদিক থেকে নিজেদের সীমার দ্বন্দ্ব এবং সেই দ্বন্দ্ব অতিক্রমের ইতিহাস। গ্যেটে তাঁর সৃষ্টিতে শুধু অতীত ও বর্তমানকেই নয়, তাদের সঙ্গে ভবিষ্যৎকেও বাঁধেন প্রাজ্ঞ মানবিকতায়। জীবনের অন্তিম পর্বেও আসন্ন মৃত্যুর অবসাদ তুচ্ছ করেই মানবসভ্যতা বিষয়ে চিরজিজ্ঞাসু সেই বিরাট মনের ভবিষ্যৎ বোঝার চেষ্টার মানবিকতা আমাদের মনকে সবল করে। বার্ধক্যের রচনা 'হ্বিলহেল্ম মাইস্টার'-এ গ্যেটের ব্যক্তির অসম্পূর্ণতার স্বীকৃতি অনুধাবনযোগ্য: শুধু সমষ্টিগতভাবেই মানব-সমাজের কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব।

জীবনের শেষমুহূর্তে গ্যেটে নাকি বলেছিলেন, আরো আলো আসতে দাও। কথাগুলো প্রবাদবাক্যের মহিমা লাভ করলেও টমাস মান যথার্থই বলেন, গ্যেটের আসল শেষ কথা যা তিনি মৃত্যুর বিরুদ্ধে এবং জীবনের সপক্ষে সারাজীবন ধরে বলে এসেছেন, তা হচ্ছে এই, সবশেষে শুধু সামনের দিকেই চলা যায়!

কোনও বিশেষ মতবাদ, শুধু নিজের প্রত্যয়বিরোধীই নয়, ব্যক্তিগতভাবে তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও কি কঠিন সততায় তার প্রাথমিক ইতিহাসকে বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে, মানকৃত নীট্‌সের জীবন ও চিন্তা বিশ্লেষণই তার অভিজ্ঞান। নীট্‌সে ফ্যাসিস্টদের আদিগুরু এবং তাদের জন্যই মানকে স্বদেশ ছাড়তে হয়। কিন্তু এই আলোচনাটির কোথায়ও ব্যক্তিগত জ্বালা ফুটে বার হয় নি, শিল্পীর ব্যক্তিগত আসক্তিহীনতা এবং অন্তর্দৃষ্টির দুরূহ পরীক্ষায় টমাস মান নিঃসন্দেহে গৌরবের সঙ্গে উত্তীর্ণ। এই নৈর্ব্যক্তিক

সততায়ই নীট্‌সের মতো অবক্ষয়ের প্রতিভা তথা আমাদের সভ্যতার সংকটকে বোঝা সম্ভব।

বালক নীট্‌সে ছিলেন নিতান্ত ভালো ছেলে, অতিমাত্রায় ধার্মিক, যার জন্যে ঠাট্টা করে তাঁকে ক্ষুদে পাদরি বলা হত। একবার তাঁকে তুমুল বৃষ্টিতেই মেপে পা ফেলে গম্ভীর চালে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরতে দেখা যায়, কারণ স্কুলের নিয়মানুযায়ী রাস্তায় যে শালীনভঙ্গীতে চলাফেরা করতে হবে!

প্রথম জীবনেই নীট্‌সে অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দেন এবং সেই সঙ্গে আকাশস্পর্শী উচ্চাকাঙ্ক্ষারও। বিখ্যাত ঐতিহাসিক বুর্খার্টকে নীট্‌সে পিতার মতোই দেখতেন, কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই তাঁর কাছে এই তরুণ বন্ধুটির প্রবণতার তীব্রতাকে অস্বাস্থ্যকর এবং বিপজ্জনক ঠেকেছিল। বুর্খার্ট তাঁকে পরিহার করেন।

অতঃপর নীট্‌সের জীবনে যে দুর্ঘটনা ঘটে, তার উপক্রমণিকা তিনি নিজেই বন্ধুর কাছে বলে গেছেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে একুশ বছরের তরুণ নীট্‌সে একবার কোল্‌ন্‌-এ বেড়াতে যান, সেখানে শহরের দ্রষ্টব্যগুলো দেখিয়ে দেবার জন্যে এক গাইড নিযুক্ত করেন। সারা বিকেল ঘোরার পর সন্ধের সময় কোনও ভালো রেস্তোরাঁয় নিয়ে যেতে বললে সেই "শয়তানের দূত" গাইডটি তাঁকে এক গণিকালয়ে নিয়ে আসে: "কুমারীর মতো বিশুদ্ধ" জ্ঞানচর্চার পথিক সোপেনহাওয়ার-এর ভক্ত ছেলেটি হঠাৎ দেখল, "পাতলা স্বচ্ছ পোশাকে আর ঝকঝকে গয়নায় ছটি প্রেতিনী তাকে ঘিরে ধরল উৎসুক দৃষ্টিতে। এই নরকের পেছনের দিকে ছিল একটা পিয়ানো, সেই সঙ্গের মধ্যে শুধু এরই আত্মা ছিল (নীট্‌সের নিজের কথায়)।" গণিকাদের মাঝখান দিয়ে হেঁটে নীট্‌সে পিয়ানোর কাছে গেলেন ও দু-একটি ঝংকার তুললেন। এতক্ষণ তিনি প্রায় মূর্চ্ছাতুর অবস্থায় ছিলেন, এবারে সেই ঘোরটা কাটল, রাস্তায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বেরিয়ে এলেন।

কিন্তু কল্পনায় স্মৃতিতে এ দৃশ্যের অনপনেয়, সর্বনাশা প্রভাব থেকে গেল। ঠিক তার পরের বছরে তেমনি আর একটি নরকে গিয়ে নীট্‌সে তাঁর দেহে ইংগিত ব্যাধির বিষ বয়ে নিয়ে এলেন, এবং পরের বছরে আবার সংক্রাম ঘটল। তারপর অসহনীয় রোগযন্ত্রণায় নীট্‌সের জীবন ক্রমাগত বিধ্বস্ত হতে লাগল।

কিন্তু ব্যাধি তো শুধু তাঁর শরীরে নয়, মনেও ছিল, ছিল সে-যুগের সামাজিক আবহে যার কাছে 'জরথুস্ট্র'-এর লেখক আত্মসমর্পণ করলেন। ফরাসী বিপ্লবের পর ইয়োরোপীয় সভ্যতায় যে সকংট দেখা দেয়, তারই প্রতিক্রিয়ায় অনেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিজ্ঞানবুদ্ধির ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে প্রবৃত্তিমার্গে জৈবশক্তির উপাসনায়ই, জীবনবিদ্রোহী ইস্‌থেটিক রুচিতে আত্মরক্ষার পথ খুঁজেছিলেন, সেই ধারায়ই তো নীট্‌সে এবং পরবর্তীকালে কির্কেগার্ড, বের্গসঁ ইত্যাদিকে পাই। মান যথার্থই বলেন, নীট্‌সে ফ্যাসিবাদের জন্মদাতা নন, ফ্যাসিবাদই তাঁকে সৃষ্টি করেছে। নিজের লিখনৈপুণ্যে তিনি জার্মানভাষাকে সমৃদ্ধ করে গেছেন, নিউটনীয় কার্যকারণশৃংখলাবাদের যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে পদার্থবিজ্ঞানে নতুন চিন্তার উন্মেষ সম্বন্ধে যে ব্যক্তি ছিলেন সজাগ, তিনিই অতিমানুষের শক্তিমত্তার এই অমানুষিক দর্শন প্রচার করলেন, যাতে অনেক মিথ্যাচার, বর্বর নিষ্ঠুরতা, হিংস্র উৎপীড়ন আশীর্বাদপূত হল।

নীট্‌সের মতে, মানুষকে বলি দিয়েই জাতি হিসেবে মনুষ্যসমাজকে টিঁকিয়ে রাখা সম্ভব। খ্রীষ্টীয় ধর্ম এই প্রাকৃতিক নির্বাচনের বিরোধী, সেইজন্যই তার প্রতি তিনি বীতশ্রদ্ধ। জীবন এবং সমাজকে যুদ্ধের যন্ত্র হিসেবেই তিনি উল্লেখ করেন, এবং তাঁর বিকারগ্রস্ত ইস্‌থেটিক রুচিতে মনে হয়, যুদ্ধ ব্যাপারটাতে একটা লোভনীয় চোখধাঁধানো গৌরব আছে। এখানেও মান কঠিন সংযমেই বলেন: কোনও কোনও সময় নিশ্চয়ই যুদ্ধের প্রয়োজন হতে পারে। ১৯৩৮ সালে হিটলারের সঙ্গে মিউনিকের শান্তিচুক্তিতে দেখা গেছে সেই আপোসরক্ষার শান্তিবাদ ফ্যাসিস্টদের প্রতি সহানুভূতির ছদ্মবেশ মাত্র। কিন্তু যখন যুদ্ধে ব্যাপক নীতিহীনতা, প্রত্যেকটি পাশব, স্বার্থপর অসামাজিক প্রবৃত্তির নখরাঘাত দেখি, একটি সদ্যসমাপ্ত যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে এই পৃথিবীর একটি চিত্রের কল্পনা করি, তখন নীট্‌সের মতো যুদ্ধকে নিশ্চয়ই সাধ করে ডেকে আনার মত বাঞ্ছনীয় মনে হয় না।

আলোচনার শেষে তাই টমাস মান বলেন, আমাদের এখন প্রয়োজন মানসিক আবহের পরিবর্তন, মানুষ হওয়ার দুরূহতা এবং মহত্ত্বের নতুন উপলব্ধি, স্বকীয় চৈতন্যেই প্রত্যেকের একটি সার্বজনীন মৌলিক প্রবণতায় অংশগ্রহণ, যা শুধু অভিজ্ঞতা এবং যন্ত্রণার মন্থনেই সম্ভব।

আমরা মানি, শিল্পেই স্রষ্টা ও সৃষ্টির রসগ্রাহী উভয়েরই চৈতন্যের শুদ্ধি, বেদনার সমস্ত রক্তাক্ত কণ্টকই সেখানে পরম উপলব্ধির সমাহিতিতে ধন্য। কিন্তু অমানুষিক, ভয়াবহ শোষণ-শাসনের অত্যাচারে, কুটিল ক্রূর লোভে সাধারণের জীবন যখন ছিন্নভিন্ন হয়, আঘাতের পর আঘাতে অবিরাম রক্তক্ষরণে মুমূর্ষু বোধই যখন মাঝে মাঝে অসহ্য জ্বালায় জ্বলে বা রুদ্ধশ্বাস যন্ত্রণায় একটু আলোবাতাসের জন্য মাথা কুটে মরে, তখন প্রত্যেক সৎ শিল্পীরই কি থেকে থেকে মনে হয় না, বাস্তবের দায়ভাগ এতই মর্মান্তিক সত্য যে শিল্পের পরোক্ষ মুক্তি যেন মরীচিকার ছল, "জীবনের মৃণ্ময়ে" "শিল্পের চিন্ময়" গড়ার আবেগ বঞ্চনামাত্র, অপরকেই শুধু নয়, নিজেকেও! এই নিষ্ফলতার যন্ত্রণায় শিল্পের তন্ময় ধ্যান থেকে তাঁকে বারবার ব্যর্থতার গ্লানিতে অস্থির হতে হয়। কিন্তু ওদিকে আবার তাপদগ্ধ জীবনের মাটি শিল্পের শুদ্ধ আকাশের জন্য আর্ত হয়ে থাকে, শিল্পীর চৈতন্যের প্রতিটি স্নায়ুতে কোষে কোষে তারই তো দুর্জয় প্রেরণা।

নিঃশেষে ক্ষয়ে গেলেও এই নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব থেকে কোনও সৎ শিল্পীরই পরিত্রাণ নেই এবং জীবন ও শিল্পের দ্বন্দ্বময় সম্পর্কের প্রখর চেতনাই তো তাঁদের মহত্ত্বের উৎস। এই যন্ত্রণাদায়ক বিড়ম্বনাই তো দেখি চেখভ কিংবা তলস্তয়ের জীবন ও শিল্পে, এবং অতটা তীব্র না হলেও আমাদের দেশের রবীন্দ্রনাথে।

তলস্তয়ের আড়ম্বরে নয়, নিঃশব্দে, হয়তো তাঁর থেকেও আরও তীক্ষ্ণতায় এই দহনে চেখভ পুড়েছেন আজীবন। দণ্ডিতদের নির্বাসনভূমি সাখালিন দ্বীপের ভ্রমণকে নরকে অবতরণের আখ্যা দিয়ে লেখেন: "আমার চারদেয়ালের সীমায় আবদ্ধ থাকলে কি জড়বুদ্ধি লোকই না থেকে যেতাম! এই যাত্রার আগে তলস্তয়ের ক্রুয়েটজার সোনাটাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার মনে করতুম, এখন সেটা তুচ্ছ, হাস্যকর ঠেকছে।" সত্যি, চেখভের কাছে ঐ চারদেয়ালের একাকীত্বের সীমা অসহনীয় লেগেছিল, কারণ, তাঁর ধারণায়, এই পৃথিবীতে, মানুষের মাঝখানে, জীবনেই সামাজিক কর্ম দ্বারা শিল্পচর্চাকে সম্পূর্ণ করা দরকার। নিজে ডাক্তার হওয়ার দরুণ তাঁর যক্ষ্মারোগগ্রস্ত শরীর কিভাবে যে দিনের পর দিন ক্ষয়ে পড়ছে নিশ্চয়ই তাঁকে বুঝতে হয়েছে, তবু কষ্টকর সাখালিন ভ্রমণে জীর্ণ দেহকেই বিপন্ন করে তোলেন, সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের ডাক্তার হিসেবে বিরামহীন কাজ চলে, নিজের জায়গায় কলেরা প্রতিরোধের কঠিন চেষ্টাও। এদিকে সাহিত্যখ্যাতি আস্তে আস্তে

ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু হৃদয় তাতে ভরে না, অস্থিরতায় বারবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে। এই ক্রমবর্ধমান খ্যাতি নিজের সার্থকতা সম্বন্ধে শুধু সন্দেহই জাগায়, অনুতাপখিন্ন বিবেকে শুধু এই প্রশ্ন ঘুরেফিরে জাগে : "আমি কি পাঠকদের ধোঁকা দিয়েই চলেছি না যখন অত্যন্ত জরুরী প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবার ক্ষমতা আমার নেই ?"

এই কথাগুলোই টমাস মানকে গভীরভাবে নাড়া দেয় এবং তিনি চেখভ সম্বন্ধে অনুসন্ধানে অনুপ্রাণিত হন। তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের স্বৈর স্বেচ্ছাচারের শ্বাসরোধকারী আবহাওয়ায় স্বাধীনভাবে নিঃশ্বাস নেবার উপায় ছিল না। চেখভের পরিচিতদের মধ্যে অনেক গুণী ব্যক্তিই হতাশায় ভেঙে পড়েন, কেউ কেউ এই দুর্বিষহ জীবন সহ্য করতে না পেরে উন্মাদ হয়ে যান, অনেকে মদের অস্বাস্থ্যকর উত্তেজনায় নিজেদের ভুলতে চান, কারুর বা আত্মহত্যায় শোচনীয় পরিণাম ঘটে। শুধু ডাক্তারী বিদ্যার নিষ্ঠাবান চর্চাই নয়, আশেপাশের জীবনের ব্যঙ্গাত্মক নকশা রচনার খোশমেজাজেও দুঃসহতা থেকে কিছুটা মুক্তির অবসর খুঁজে চেখভ সেই সর্বনাশ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন।

কিন্তু কিছুকাল পরেই এই লঘু মেজাজের পরিবর্তে শিল্পের আগ্নেয় প্রেরণা চেখভের নিজের ভাষায়, তাঁর বিবেকে নির্দয়ভাবে ঘা দিতে থাকল। তাঁর অগোছাল নকশাগুলোয় প্রায় তাঁর অজ্ঞাতসারেই এমন এক মৌলিক সুর ধ্বনিত হল যা উভয়ত তাঁর শিল্পচৈতন্য এবং বিবেক থেকে উৎসারিত: কৌতুকের মধ্যেই বাস্তব রূপ উদঘাটন এবং জীবন ও সমাজের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষণ্ণ, তিক্ত সুর, মমতাময় অথচ সমালোচনায় তীক্ষ্ণ—মানের কথায়, এটাই তো 'সাহিত্য'। এই সুর "ভাষা, রূপ"—শিল্পাধারের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবেই জড়িত : সমালোচনাপ্রবণ এই বিষণ্ণ মানস, সুস্থ বাস্তব সত্যের শুদ্ধতা, সুন্দর মহত্তর জীবন এবং শ্রেষ্ঠতর মানবসমাজের অন্বেষায় যে বিদ্রোহপরায়ণতাই এবং শিল্পকর্মকে 'নিষ্ঠুর' জীবনপণ দায়িত্বরূপে গ্রহণ থেকেই তো চেখভের ছোটগল্পের ভাষার সংহত কঠিন দীপ্তি আসে। প্রায় পনেরো বছর পরে সঙ্গত কারণেই গকির কাছে ভাষাশিল্পী হিসেবে চেখভকে অদ্বিতীয় মনে হয়েছিল। এই রুশীয় শিল্পীর রচনা পড়েই তো টমাস মানের ছোটগল্প সম্বন্ধে তাচ্ছিল্যবোধ দূর হয়, রূপপরিমিতিতেই যে কিভাবে এই শিল্পমাধ্যম এপিকের মহিমা অর্জন করতে পারে, তাঁর দৃষ্টান্তেই তিনি বোঝেন।

কয়েকটি গল্প প্রকাশিত হবার পরও এই স্বভাবনম্র লোকটি আত্মবিশ্বাস খুঁজে পান না। অবশেষে, তুচ্ছ বিষয়ে তাঁর অনন্য প্রতিভার অপচয় না ঘটিয়ে সত্যকারের শিল্পগুণসম্পন্ন সৃষ্টিতে মনোনিবেশের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে একদা বেলিনিস্কির, পরে টুর্গেনিভ এবং ডস্টয়েভস্কির বন্ধু বৃদ্ধ গ্রীগরোভিচ্ তাঁকে যে চিঠি লেখেন, তাতেই চেখভ উদ্দীপিত হন। উত্তরে তিনি নিজের আবেগ অসংকোচে ঢেলে দেন : "আমি প্রায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলাম, আপনার চিঠি আমার মনে এক গভীর ছাপ রেখে গেছে।"

এর পর থেকে বলা যায় শিল্পকর্মে চেখভের অসাধারণ প্রযত্নের ইতিহাসের আরম্ভ। এ সময়ই তাঁর হাত থেকে 'ছ-নম্বর ওয়ার্ড'-এর মতো অসামান্য রচনা বেরিয়ে আসে। তথাকথিত স্বাভাবিক মানুষদের জগতের নির্বুদ্ধিতা এবং দৈন্যে বিতৃষ্ণ হয়ে এক ডাক্তার তাঁর হাসপাতালের বিকৃতমস্তিষ্কদের জন্য নির্দিষ্ট ছ-নম্বর ওয়ার্ডের এক রোগীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন, কারণ সাময়িক সুস্থতার মুহূর্তে ওর মতো জীবন সম্বন্ধে এমন মর্মবিদারী সত্য বলার মতো লোক তাঁর আশপাশে কেউ ছিল না। অবশেষে এই হীনতার জগৎ ডাক্তারকেই পাগল সাব্যস্ত করে গারদে পুরে রাখে, সেখানে অত্যাচারে তাঁর মৃত্যু ঘটে, মোটামুটিভাবে এই হচ্ছে গল্পটির বিষয়বস্তু। মান বলেছেন, প্রত্যক্ষ কোনও অভিযোগ না থাকলেও স্বেচ্ছাচারী রাজত্বের শেষভাগে রাশিয়ায় দুর্নীতি এবং অসহায়তায় সাধারণ মানুষের যে দুর্গতি দেখা দিয়েছিল, গল্পটিতে সেই দুঃস্থ জীবন এত তীক্ষ্ণ প্রতীকী রূপ পায় যে তরুণ লেনিন এটি পড়ে তাঁর বোনকে বলেন : "গত রাত্রিতে গল্পটি শেষ করার পর আমি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করেছিলুম। ঘরে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারি নি, উঠে পড়ে বাইরে যেতে হয়েছিল। মনে হচ্ছিল আমাকেই যেন ছ-নম্বর ওয়ার্ডে পুরে রাখা হয়েছে !"

যে তীব্রতায় চেখভের গল্প দানা বাঁধে, দ্বন্দ্বসংঘাতময় জীবন নিটোল রূপ পায়, তার মূলে আছে সমসাময়িক জীবন সম্পর্কে শিল্পীর সদাজাগ্রত চেতনা এবং মানবিক মূল্যবোধ। শিল্পরূপের সঙ্গে যুগবিচারের দৃষ্টিভঙ্গির আত্যন্তিক যোগ এই শিল্পীর বিকাশে সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় : সমাজের যে সমস্ত শক্তির স্থান হবে অতীতের ধ্বংসস্তূপে, আর যাদের ইঙ্গিত ভবিষ্যৎ যুগেরই দিকে—সেই কালচেতনা গভীরতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পরূপে তাঁর কর্তৃত্বও অধিকতর পরিণত হয়েছে।

জীবনের অন্তিম মুহূর্ত যতই আসন্ন হয়েছে, অবক্ষয়ের সন্ধিক্ষণে, অসংখ্য প্রাণের ভগ্নস্তূপ আর ব্যর্থতার হাহাকারের মাঝখানে চেখভ ততই প্রবল আবেগে সপ্রেম উৎসুক দৃষ্টিতে ভবিষ্যতের নতুন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন কর্মিষ্ঠ সমাজের আবির্ভাবকে খুঁজেছেন, রাত্রির গাঢ় অন্ধকারেও যার চকিত উদ্ভাসই হৃদয়কে আশ্বস্ত করে। তাঁর শেষ নাটক 'দি চেরি অরচার্ড', বিশেষত শেষ গল্প 'কনে'-তেই ব্যাপক ক্ষয়ের মধ্যেই সূর্যের আলোকসম্ভাবনায় উদ্বেল অঙ্কুর-প্রাণের উত্তাপ পাই। গল্পটির নায়িকা সুখী সচ্ছল পরিবারের মেয়ে নাস্তাকে বাল্যসঙ্গী, তার স্রষ্টাকর্তার মতো যক্ষ্মারোগী, মৃত্যুপথযাত্রী, শাশা এই অস্তিত্বের মিথ্যাচার থেকে বেরিয়ে আসতে বলে, জীবনের আবর্জনা থেকে বার হওয়াই সব থেকে জরুরী। নাস্তা সত্যি তার শ্রেণীজীবনের সমস্ত সুখস্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। কিছুকাল পরে সে তার পুরনো বাড়িতে ফিরে আসে, এতদিনকার পরিচিত শহরের সমস্ত কিছুই তার কাছে জরাজীর্ণ মনে হয়, তাদের মধ্যে যেন হয় ধ্বংসের নতুন নতুন উজ্জ্বল এক জীবনের প্রতীক্ষা। হতভাগ্য শাশাও তো তাকে বলেছিল: "তোমার শহরের একটি পাথরও অবশিষ্ট থাকবে না, ভিত্তিমূল থেকে সবকিছু গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে, তারপর যেন মন্ত্রের পরিবর্তনের মতোই বড়ো বাগান নিয়ে বিরাট বিরাট সুন্দর বাড়ি উঠবে, নতুন ধরনের মানুষ সেখানে বাস করবে, প্রত্যেকেই জানবে কিসের জন্য তারা বাঁচছে, বাঁচার অর্থ কী।"

অবিশ্যি 'কনে'র মতো দু-একটি রচনা ছাড়া ভবিষ্যৎদ্রষ্টার এই প্রত্যয়ের প্রত্যক্ষ স্থিরতার চেয়ে জীবন সম্পর্কে চেখভের কঠিন প্রশ্নই বেশি মেলে, যার সততায় বীজকম্প্র অন্ধকারে ভবিষ্যৎকে অনুভব করি গূঢ় ইঙ্গিতে, অধিকতর যন্ত্রণার তীক্ষ্ণতায়। চেখভের জীবন ও শিল্পের সামগ্রিক বিচারে 'একটি ক্লান্তিকর গল্প'-কেই মানের কাছে সব থেকে তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়, এইটিই তাঁর প্রিয় রচনা। সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে তিনি এর তুলনা খুঁজে পান না। গল্পটির নায়ক এক বৃদ্ধ, অসুস্থ চিকিৎসাবিজ্ঞানী। জীবনের শেষভাগে আবিষ্কার করেন, কোনও কেন্দ্রীয় প্রত্যয়ের সংহতিতে তিনি জীবনকে বেঁধে রাখতে পারেন নি, ঘর এবং বাইরের অন্তঃসারশূন্য জীবনের গ্লানিতে, দুর্চিন্তায় নৈরাশ্যে এই বিস্বাদ জীবন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়েছে। বন্ধুর কাছে লেখা চিঠিতে এই আহত হৃদয়ের আকুলতা প্রকাশ পায়: একটি নির্দিষ্ট দর্শন ছাড়া সচেতন জীবন তো জীবনই নয়, বোঝা, দুঃস্বপ্ন মাত্র।

নিজের খ্যাতিও বঞ্চনা মনে হয়। গল্পের লেখকের আয়ুও তো এ সময় ফুরিয়ে আসছিল, আসন্ন মৃত্যুর পাণ্ডুর আলোকে আত্মসমীক্ষায় নিজের ক্রমবর্ধমান খ্যাতিকে অস্বস্তিকর ঠেকেছে, সমস্ত চৈতন্যে যক্ষ্মাবীজাণুবিধ্বস্ত ফুসফুসের পরতে পরতে সেই মর্মন্তুদ প্রশ্ন যা দিয়েছে অবিরাম: অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবার ক্ষমতা যখন নেই, তখন নিজের লিখন-নৈপুণ্যের দীপ্তিতে তিনি কি পাঠকদের ঠকিয়েই চলেছেন না? কেন তিনি লেখেন, কি তাঁর উদ্দেশ্য, বিশ্বাস। কোথায় তাঁর জীবন ও সাহিত্যকর্মের মূল ভাবনা যা ছাড়া সমস্ত কিছু অর্থহীন। আবার আমাদের স্মরণ করতে হয়, বুকের রক্ত যতই ঝরুক, ব্যক্তিস্বরূপের সার্থকতার এই প্রশ্ন থেকে শিল্পীর মুক্তি নেই। ভারতবর্ষের কবির মানসেও রূপনারায়ণের কূলে সত্তার প্রথম আবির্ভাবে যেমন, তেমনি অবসন্ন চেতনার গোধূলি বেলায়ও সেই একই প্রশ্নই জাগে, পার্থক্য শুধু এদেশসুলভ মন্ত্রোচ্চারণের শান্ত ভঙ্গিতে।

গোড়ার দিকে টমাস মান যে প্রশ্ন তোলেন, শেষভাগে তাতেই ফিরে আসেন। 'ক্লান্তিকর গল্প'-এর পণ্ডিত ব্যক্তিটি তাঁর মৃত বন্ধুর মেয়ে সমাজ-পরিত্যক্তা ব্যর্থ অভিনেত্রীটিকে গোপন ভালোবাসায় অভিষিক্ত করেছিলেন চারদিকের আত্মসুখসন্ধানী ইতরতার মাঝখানে তার বেদনাশুচি মনের স্পর্শ পেয়ে। সেও একদিন প্রবল সন্দেহ ও হতাশার যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে তার অভিভাবক জ্ঞানী ব্যক্তিটিকে জিজ্ঞেস করে: "আমি কি করব, আপনাকে অনুনয় করছি, শুধু একটি কথায় বলে দিন আমি কি করব?" এদেশের মেয়ে দামিনীও তো আত্মসচেতনতার যন্ত্রণায় জর্জরিত শচীশকে সেই কঠিন প্রশ্নই করে দুঃসহ ব্যাকুলতায়, শচীশের মতোই পণ্ডিত ব্যক্তিটিকে অসহ্য কষ্টে বলতে হয়, আমি জানি না, আমার বিবেকের দোহাই দিয়ে বলছি, আমি জানি না। তাঁর সমস্ত সত্তা জুড়েও তো এই জিজ্ঞাসারই দহন।

সংশয় দ্বিধা দ্বন্দ্বে মথিত অস্তিত্বের এই মৌল প্রশ্নই তো চেখভের অধিকাংশ গল্পের ধুয়ো। তৎকালীন রাশিয়ায় সত্য ও বাস্তব পরিবেশের যে দুর্বিষহ, জটিল বিরোধ ছিল, বিশেষ করে তাতেই তো সাধ ও সাধ্যের বিড়ম্বনা শিল্পীর পক্ষে মর্মান্তিক হয়ে দাঁড়ায়। শিল্পসাহিত্যের স্তরে উত্তর হাতে হাতে জুগিয়ে দেওয়া যায় না। জোড়াতালি দেওয়া সমাধানের স্থূলতায় নয়, ঐ সৎ, দধীচির অস্থির মতো কঠিন প্রশ্নেই তো জীবনের অপরিমেয় সম্ভাবনাকে অনুভব করি, তার আগুনে নতুন সংগঠনের উদ্দীপনা পাই, আর বেদনার শেষবিন্দুতে যখন

সে জিজ্ঞাসা এসে থামে, তখন সে "কান্নার অতলজলে" "ভবিষ্যতের আনন্দ-ভৈরবী"ই কান পেতে শুনি।

সাধ ও সিদ্ধির দ্বন্দ্বময় প্রশ্নের আঘাতে হৃদয় হাহাকার করে উঠলেও চেখভ দিনের পর দিন অপরিসীম নিষ্ঠায় ধৈর্যে লিখে গেছেন নিজেকে পুড়িয়ে, ক্ষয় করে। গর্কি যথার্থই বলেন, সমস্ত সংস্কৃতির মূল ভিত্তিই যে হল কাজ, পরিশ্রম, চেখভ ছাড়া সেটা এমন গভীরভাবে উপলব্ধি করার মতো লোক আর কাউকে তিনি পাননি। পরগাছা জীবনের আলস্যে তাঁর বিপুল ঘৃণা ছিল। সমাধান হাতের মুঠোয় না আসুক, নিজের কাজের মূল্য সম্বন্ধে সংশয়দ্বিধা যতই থাকুক, ঐ অন্তহীন যন্ত্রণায় সৎ শিল্পীকে গল্প বলে যেতে, সত্যকে রূপ দিতে হয় নিজের শেষ রক্তবিন্দুটি দিয়ে এবং সুস্থ, মহত্তর ভবিষ্যতের আবেগে বুক বেঁধে।

টমাস মানের আলোচিত চারজন ব্যক্তিই ছিলেন ব্যাধিগ্রস্ত, গ্যেটেকেও তো দীর্ঘকাল যক্ষ্মার বিরুদ্ধে যুঝতে হয়েছিল। শুধু দুর্জয় প্রাণশক্তিই তাঁকে অবসন্ন হতে দেয়নি। নীট্‌সের দেহমনের ব্যাধির অনিবার্য পরিণাম তো উন্মত্ততায়। আজকের ক্ষয়িষ্ণু পশ্চিমী সভ্যতার উচ্ছিষ্টবিলাসী শহুরে মহল থেকে যখন বারবার উচ্চারিত হচ্ছে, শিল্পী ও শিল্পের স্বাধীনতা শুধু আত্মরতির অস্বাস্থ্যকর চর্চায়, তখন মানের আলোচনায় ব্যাধির নিপীড়নের মধ্যেই গ্যেটে শীলার চেখভের মতো মহৎ শিল্পীদের দায়িত্ব পালনের দৃষ্টান্ত আমাদের মতো সাধারণদের আশ্বস্ত করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকেই লক্ষ্য করি, ভেতর ও বাইরের দ্বন্দ্বের প্রতিক্রিয়ায় যাঁরা অহংসর্বস্বতায় আশ্রয় নিতে চেয়েছিলেন, তাঁদের অধিকাংশেরই পরিণাম ঘটেছিল ক্লাইস্টের আত্মহত্যায় বা হোয়েল্ডারলিনের উন্মাদরোগে। আত্মপরায়ণতার ব্যাধিতে শুধু আত্মার অপমৃত্যুই ঘটে। ভারসাম্যহীন অবক্ষয়িত সমাজে আত্মসচেতনতা ও নিদারুণ ব্যাধির তীব্রতায়ই দেখা দেয়, কিন্তু এই আগুনে শিল্পী যখন পোড়েন, তখন একটি প্রাণের মধ্যেই তো নিজেদের নতুন করে চিনি। অপমৃত্যুর ব্যাধির পাশাপাশি, বিশেষত শেষ প্রবন্ধটিতে মান আমাদের দেখান, রোগজীর্ণ শরীরে মনেও সমসাময়িক সমাজের ব্যাধির যন্ত্রণা নিয়ে সচেতন সংবেদনশীলতায় জীবনকে তার দ্বন্দ্বসংঘাতে সমগ্রতায় গ্রহণ করেন নীলকণ্ঠ-শিল্পী, কেমন করে বাঁচতে হবে—জীবনের সেই সমস্যাসঙ্কুল ক্ষুরধার জিজ্ঞাসায়ই ব্যক্তিজীবনের দুঃখবেদনার অমৃতরূপ দেন। এক মহৎশিল্পীর মননের আধারে আর মহৎশিল্পীর জীবন ও শিল্পের মানবিক তাৎপর্য ধরা পড়ে, সেই যুক্তবেণীতেই তো আমাদের চৈতন্যের মুক্তিস্নান ঘটে।

Thomas Mann : **Last Essays.** Secker & Warburg. 21sh.

নেপথ্য থেকে

দুর্গাদাস সরকার

জাহাজে যে কয়লা ভাঙত অকস্মাৎ কাল গেছে মারা।
ডেকের ওপরে পোড়া ছন্নছাড়া মুখ যায় না চেনা,
দেখেও কে ভাবতে পারে এই সেই ইব্রাহিম শেখ।
দুবেলা যে এসে বসত, গল্প করত, সমুদ্রের ফেনা
মুখে ঘষে কালি মুছত, ছিল যার কিছুটা বিবেক,
সবাই ঘুমোলে পর রাত জেগে যে দিত পাহারা,
পাটাতনে অঙ্ক কষত কালি দিয়ে—দেশে কত দেনা,
দাঁতে ছিঁড়ত বাসি রুটি—আজ সে-ই মানুষ আরেক!

সমুদ্রের জলের গভীরে হবে কবর যদিও,
কালো শার্ট টানবে মাছে, হাঙরে লুঙিটা খাবে ছিঁড়ে,
তার মাংসে ভোজ দেবে সিন্ধুশঙ্খ সাগরের তীরে,
অস্থিগুলো ভাসবে তবু। জাভা-চীন-মালয় বনিয়ো
ঘুরে-ফিরে মানুষের চিন্তায় জড়াবে। তারপর
হা হা করে হাসবে শুধু আমাদের অস্থির ভেতর।

দুই রঙ

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

পেরিয়ে এসেছি সেই পদ্মদীঘি ;

সামনের আকাশে লাল ধুলো আর ধোঁয়ার কুণ্ডলী
পাক খেতে খেতে
ফোটা শিমুলের রূপের টানে থমকে দাঁড়াচ্ছিল,
বধূর অসাবধানতার সুযোগে যেমন তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে পুরুষ
দেখছিল তেমনি করেই।

এলো হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছিল আবার :

এলো হাওয়ার মতোই উদ্দাম ঐ অশ্বত্থের ডালটা
যখনতখন মাতাল হয়,
পাতাগুলো এখনও ঘন সবুজ হয় নি—
জুড়িয়ে আসা গলানো লোহার যেমন রং—তেমনি দেখতে।

কারখানার কাজের ফাঁকে—হাসিঠাট্টার ঝঙ্কার,
খুনসুটি,
মান আর অভিমানের ছন্দ—
আর কেউ না দেখুক দেখেছে ঐ বুড়ো অশ্বত্থ গাছটা,
কিছু বলে না মাঝে মাঝে শুধু মাতাল হয়।

গলানো লোহার রং দেখে
মেয়েটার লোভ হয় ছুঁয়ে দেখতে,
'বাব্বাঃ, ইস—পুড়ে ছাই হয়ে যাব'—
মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় তক্ষুনি।
আবার কখনো বলে—'ঠিক সুয্যির মতন
যখন ডোবে তাল-বোনার ধারে।'

একদিন কেমন করে খানিকটা সূর্য চলকে পড়েছিল
আর সেই সঙ্গে চুন্নীর মুখ গিয়েছিল খুলে।

রঙের নেশায় না ভুল করে
মেয়েটি রঙের মাঝেই ডুবল,
মিশে গেল তারপর।
বুড়ো অশ্বত্থ তবুও মাতাল হয়।

মানুষ শহর সমুদ্র

কমলেশ সেন

দুহাত, হাতদুটো যখন স্থাপত্যের লাবণ্যে
উজ্জ্বল, উজ্জ্বলতর কথাগুলো
আকাশে-মহাকাশে দ্রাঘিমায় অক্ষাংশে
ভেঙ্গে ভেঙ্গে সূর্যস্তম্ভ
বিদ্যুৎ স্তম্ভ, অরণ্যে যেন, যেন অরণ্যের
গভীরতায় কথার শহর, শহরের কথা।

শহর, শহরের বুকে, বুকের কলিজায়
জলপ্রপাত হিমালয় সমুদ্র
ইস্পাত শহর ইস্পাত মানুষ
ভালোবাসার মানুষ।

মানুষ,
মানুষ শহরে
জলপ্রপাতে হিমালয়ে সমুদ্রে
মানুষের শহর, মানুষের জলপ্রপাত
মানুষের সমুদ্র হিমালয় মানুষ।

যদিও কথাগুলো, কথাগুলো সূর্যের উরসে,
ডুবে ডুবে আগুন, আকাশ গলে গলে
মাটির সমুদ্রে, পায়ের সমুদ্রে
কৃষ্ণচূড়ার সমুদ্র, সমুদ্রের সূর্য
হিমালয় রক্তগোলাপ, আগ্নেয়গিরির হিম্মত।

যদিও ভালোবাসার মেয়েগুলো
হিরণ্যগর্ভ, গনগন চুলের অরণ্য
অরণ্যের চুলে অগ্ন্যুৎপাত

ভালোবাসার মেয়েগুলো, ছেলেগুলো
ভালোবেসে, ভালোবাসতে বাসতে
অরণ্য, গভীর চোখের অরণ্য, মেঘডম্বরু
ভালোবাসার চকমক বিদ্যুৎ, ঠমক
গমক, পাখোয়াজ।

মানুষ, অগ্নিক্রান্ত মানুষ
বাতাসে, রক্তের বাতাসে
পেশীতে, গুরু গুরু চেতনা সংহাতে
সমুদ্র, লোনা সমুদ্র, জলোচ্ছ্বাস
ভালোবাসার বিদ্যুৎপ্রণাম, ভালোবাসার প্রণাম।

কথাগুলো কলিজার রং-এ ডুবে ডুবে
বিদ্যুৎ-ইস্পাত।

শান্তিনিকেতনে 'গান্ধী-পুণ্যাহে'র গোড়ার কথা

সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রতি বৎসর শান্তিনিকেতনে ১০ই মার্চ তারিখে 'গান্ধী-পুণ্যাহ' উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। ঐ দিনটির আরম্ভের কথা এবং গান্ধীজির সঙ্গে শান্তিনিকেতন ও গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ের সূত্রপাতের মোটামুটি একটা বিবরণ নীচে দেবার চেষ্টা করা হল।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতবাসী সম্বন্ধে সেখানকার সরকার নানারকম অন্যায় নিয়মকানুন, বিধি-নিষেধ, অতিরিক্ত কর ইত্যাদি চালু করবার চেষ্টা করছিলেন, আর দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের নেতা মিঃ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী সে-সকল অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে নিরুপদ্রব সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম চালনা করে বারবার লাঞ্ছনাভোগ ও কারাবরণ করেছিলেন—এ সকল কথা আমরা শান্তিনিকেতনের সে সময়কার ছাত্র ও অধ্যাপকরা কিছু কিছু জানবার সুযোগ পেয়েছিলাম এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সন সাহেবদের কাছ থেকে। এ হল ১৯১৩-১৪ সালের গোড়ার দিককার কথা।

এই দুই মহাপ্রাণ ইংরেজ সবেমাত্র শান্তিনিকেতনে যাতায়াত শুরু করেছেন—আশ্রমের আদর্শের এবং গুরুদেবের প্রতি একটু একটু আকৃষ্ট হচ্ছেন। এণ্ড্রুজ সাহেব কয়েক বছর হল ভারতবর্ষে এসেছেন। তিনি নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টান পাদ্রী—রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "ইনি পাদ্রীর চেয়ে খৃষ্টান বেশি।" ১৯০৪ সালে দিল্লীর সেণ্ট স্টিফেন্‌স্ কলেজে যোগ দিতে তিনি এদেশে আসেন। তাঁকে ঐ কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করা হয় কিন্তু এণ্ড্রুজ সাহেব তৎক্ষণাৎ সে-পদ প্রত্যাখ্যান করে সুশীল রুদ্রকে অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত করে নিজে উপাধ্যায় হলেন। তিনি বললেন, "ভারতবর্ষে আমি চিরদিন ভারতীয়ের অধীনে কাজ করব, তাদের উপরে নয়।" এই একটি ঘটনা থেকে ভারতবাসীর প্রতি তাঁর মনোভাব বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়। ভারতবর্ষের সরকারী ও বে-সরকারী মহলে এণ্ড্রুজ সাহেব বিশেষ পরিচিত ও দীন দরিদ্র ভারতবাসীর অসীম দরদী

বন্ধু ছিলেন। বিলাতের এবং ভারতের শাসক সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় অনেকেই তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন। এমনকি তদানীন্তন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ছিলেন তাঁর বিশেষ বন্ধু। সেইজন্য রাজদ্বারে এবং দরিদ্রের কুটিরে তাঁর অবাধ গতিবিধি ছিল। এণ্ড্রুজ সাহেব সম্বন্ধে এত কথা বলা দরকার এইজন্য যে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির মধ্যে প্রথম যোগসূত্রের কারণ এবং আজীবন সেতু হলেন এণ্ড্রুজ সাহেব।

১৯১২ সালে গুরুদেব বিলাতে যাবার কয়েকদিন পরে তাঁর বন্ধু শিল্পী রদেনস্টাইনের গৃহে ইংরেজী গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি বিশিষ্ট সাহিত্যিক বন্ধুমহলে পাঠ করে শোনান কবি য়েট্‌স্। এই পাঠসভায় এণ্ড্রুজ সাহেব উপস্থিত ছিলেন। তারপরই গুরুদেবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং সেই পরিচয় আজীবন অকৃত্রিম বন্ধুত্বে পরিণত হয় একথার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। এ দিকে স্বদেশে ও বিদেশে লাঞ্ছিত দরিদ্র ভারতবাসীর প্রতি বেদনাভরা সহানুভূতিতে তাঁর যোগ ছিল মহামতি গোখ্‌লে প্রভৃতি ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে।

এণ্ড্রুজ সাহেবের বিশেষ বন্ধু ছিলেন পিয়ার্সন সাহেব। তিনি দিল্লীতে এক ধনীপুত্রের গৃহশিক্ষক ও অভিভাবক ছিলেন। ১৯১২ সালে যখন গুরুদেব বিলাতে, সেসময়ে এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সন দুজনেই ছুটি নিয়ে বিলাতে ছিলেন। এণ্ড্রুজ সাহেব গুরুদেবের কবিতাপাঠ সভায় উপস্থিত ছিলেন তা আগেই বলা হয়েছে। একদিন তাঁর বন্ধু পিয়ার্সনকে গুরুদেবের কাছে নিয়ে যান। কিন্তু তিনি বাড়ি না থাকায় দেখা হয় না। শুনলেন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একজন ভারতীয় ছাত্র বক্তৃতা দিচ্ছেন। সেই সভায় গিয়ে দেখেন রবীন্দ্রনাথ সেখানে উপস্থিত। বক্তা হলেন 'আবোল তাবোল'-এর লেখক স্বনামধন্য সুকুমার রায়। বক্তৃতার পর পিয়ার্সন সাহেবের সঙ্গে গুরুদেবের প্রথম সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হয়। এণ্ড্রুজ সাহেবের ফেরার আগেই পিয়ার্সন সাহেব ভারতে ফিরে শান্তিনিকেতন দেখবার জন্যে আসেন। দিল্লী যাবার আগে পিয়ার্সন সাহেব কয়েকবছর কলকাতায় লণ্ডন মিশনারি কলেজে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা অধ্যাপনার কাজ করতেন। সেই সময়ে তিনি বাংলা ভাষা শেখেন। ইংরেজের মুখে বাংলা কথা শুনে আমরা খুব আমোদ অনুভব করেছিলাম এবং ভাষার দুর্গম বাধা না থাকায় তাঁর সঙ্গে আমাদের ভাব হতে একটুও দেরি হয়নি সে-কথা এখনও বেশ মনে আছে। পিয়ার্সন সাহেব কয়েকদিন আশ্রমে কাটিয়ে দিল্লী চলে গেলেন। এর কয়েক মাস পরে ১৯১৩ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী এণ্ড্রুজ

সাহেব শান্তিনিকেতন দেখতে আসেন। এইভাবে এই দুই মহাপ্রাণ ইংরেজের রবীন্দ্রনাথ তথা শান্তিনিকেতনের সঙ্গে আজীবন যোগের সূত্রপাত হয়। তার ইতিহাস স্বতন্ত্র।

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের অবস্থা এবং মিঃ গান্ধীর নিরুপদ্রব সত্যাগ্রহ পরিচালনা বিষয়ে সঠিক খবরাখবর জানবার জন্যে এবং সেখানকার সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা চালানো সম্ভব কিনা এ সব বোঝাপড়ার জন্যে মহামতি গোখ্‌লের অনুরোধে এণ্ড্রুজ সাহেব দক্ষিণ আফ্রিকা যাওয়া ঠিক করেন। পিয়ার্সন সাহেবও বন্ধুর সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। এই দুই বন্ধু আশ্রম থেকেই যাত্রা করেন। দক্ষিণ আফ্রিকাপ্রবাসী ভারতবাসীর অবস্থা ও মিঃ গান্ধীর সংগ্রামের কথা আমরা সেই সময়েই কিছু কিছু জানতে পারি। আশ্রম থেকে তাঁদের যাত্রার তারিখ হল ৩০শে নভেম্বর ১৯১৩। ঐদিন সকালে আশ্রমবাসী সকলকে নিয়ে গুরুদেব মন্দিরে উপাসনা করলেন। বিদায়-সভায় পিয়ার্সন সাহেব বাংলায় বলেন, "আমার এবং আমার বন্ধুর একটিমাত্র কথা তোমাদের বলছি যে এই শান্তিনিকেতন আশ্রম থেকে যে-শান্তি আমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি তা দক্ষিণ আফ্রিকায় আমাদের কাজে সাহায্য করবে।" এখনও বেশ মনে আছে সভার পরে পিয়ার্সন সাহেব 'শান্তিনিকেতন'-অতিথিশালার দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন আর তাঁর সঙ্গে উঠতে উঠতে তাঁকে বলছি: "মিঃ গান্ধীর দলের লোকদের বলবেন যে তাদের এই সংগ্রামে তারা একলা নয়, আমরা সবাই মনে মনে তাদের সঙ্গে আছি।" তখন মিঃ গান্ধী বলতাম; গান্ধীজি বা অন্য সম্বোধন চালু হয় নি।

আফ্রিকায় চারমাস কাটিয়ে পিয়ার্সন সাহেব আশ্রমে ফিরে এলেন— এণ্ড্রুজ সাহেব গেলেন বিলাতে মার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে। পিয়ার্সন সাহেব ৩১শে মার্চ ১৯১৪ বোলপুর এসে পৌছলেন। তাঁকে অভ্যর্থনা করে আনবার জন্যে আমাদের সঙ্গে গুরুদেবও স্টেশনে গিয়েছিলেন। আশ্রমে পৌছলে আমরা আমাদের প্রথামতো মাল্যচন্দনে ভূষিত করে বেদমন্ত্র আবৃত্তি করে গান গেয়ে তাঁকে সমাদর করে নিলাম। আমাদের অভ্যর্থনার পর পিয়ার্সন সাহেব বললেন যে এতদিন পরে আশ্রমে ফিরে এসে তাঁর খুবই আনন্দ হচ্ছে। যতদিন তিনি দূরে ছিলেন দিনরাত্রি আশ্রমের স্বপ্নই দেখেছেন। সেখানে এতদিন বাংলা ভাষা বলার সুযোগ পান নি। একবার একটি

বাঙালীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় সে মোটেই বাংলা জানে না কারণ তার জন্ম হয়েছিল ঐ আফ্রিকাদেশে।

এর পর প্রায় রোজই আমরা পিয়ার্সন সাহেবের কাছ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতবাসীর এবং ঐ দেশের অধিবাসীর কথা শুনতে লাগলাম। ঐ দেশের লোকেদের তৈরি অনেক জিনিসপত্র আমাদের দেখাবার জন্যে তিনি এনেছিলেন। যেমন তাদের নানারকম বাদ্যযন্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র, গহনা ইত্যাদি। আমরা সেগুলো দেখে খুবই আনন্দ পেতাম।

একদিন তিনি আমাদের ইংরেজী সাহিত্য-সভায় দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। বিশেষ করে সেখানকার প্রবাসী ভারতবাসীদের কথা। কেন হাজার হাজার ভারতীয় দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিল, ঐ দেশের সরকার ভারতীয়দের উপর কী কী নতুন আইন জারি করেছিলেন—আর ঐ সব জুলুম ও আইনের বিরুদ্ধে মিঃ গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন—ভারতীয় স্ত্রীপুরুষের কারাবরণ, লঞ্ছনার কথা আমরা সবিশেষ জানতে পেলাম। তাতে ঐ দেশের ভারতীয়দের প্রতি আমাদের সমবেদনা ও সহানুভূতি হতে লাগল, আর তারা আমাদের আরও কাছে এসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মিঃ গান্ধী পরিচালিত ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছেলেদের ও কর্মীদের কথাও আমরা জানতে পেলাম। গান্ধী-পরিবারভুক্ত হয়ে কয়েকটি ভারতীয় ছেলে মানুষ হয়ে উঠছিল—তাদের মধ্যে গুজরাটী ও তামিল বেশি। ঐ ছেলেরা নিজেদের কাজ নিজেরাই সব করে, হাতের কাজ ও শিল্প শেখে, সঙ্গে সঙ্গে পড়াশুনাও করে, বাগান করে, রাস্তাঘাট তৈরি করে—সব নিজেরাই। সঙ্গে আছেন মিঃ গান্ধী ও তাঁর পত্নী কস্তুরাবাঈ এবং শিক্ষকরা। মিঃ গান্ধীর এই আশ্রমের ছাত্র, অধ্যাপক ও অন্যান্য অধিবাসীর মন্ত্র ছিল: ১। স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা; ২। দুঃখকষ্ট বরণ করে নেবার জন্যে সর্বদা প্রস্তুতি; ৩। কায়-মনোবাক্যে সত্যাগ্রহী হওয়া অর্থাৎ অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা খাড়া করে দাঁড়ানো আর সর্বতোভাবে সত্যপালন।

এই আশ্রমে একটি ছোট ছাপাখানাও ছিল—তার থেকে একটি ইংরেজী ও গুজরাটী ভাষায় খবরের কাগজ বার হত—নাম ছিল 'Indian Opinion'। ছেলেদের হাতের কাজের নিদর্শনও পিয়ার্সন সাহেব সঙ্গে এনেছিলেন। একটা চামড়ার কোমরবন্ধ দেখিয়ে বললেন, "এটা মিঃ গান্ধীর ছেলে রামদাসের নিজের হাতের তৈরি।" এণ্ড্রুজ সাহেব ঐ স্কুলের ছেলেদের

তৈরি চামড়ার একজোড়া চপ্পল কিনেছেন—তিনি নিজেও একজোড়া চপ্পলের অর্ডার দিয়ে এসেছেন।

সরকারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ চালাবার সময় এই আশ্রমের অধিবাসী সকলেই কারাবরণ করেছিলেন। রামদাসের লেখা তার সুন্দর বৃত্তান্ত আমাদের সেই সময়কার হাতে লেখা ইংরেজী মাসিকপত্র 'The Asram'-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

ইতিমধ্যে এণ্ড্রুজ সাহেব এদেশে ফিরে এসে ১৯১৪ সালের ১৭ই এপ্রিল আশ্রমের কাজে যোগ দিলেন। তাঁকে আমরা যথারীতি অভ্যর্থনা জানালাম। গুরুদেব তাঁর উদ্দেশে যে বাংলা কবিতাটি লিখেছিলেন: "প্রতীচীর তীর্থ হতে প্রাণরসধার, হে বন্ধু এনেছ তুমি, করি নমস্কার"—তারই ইংরেজী অনুবাদ: "Friend, thou hast brought the water from the spring of life in the West, we salute thee" ইত্যাদি পাঠ করেন।

আশ্রমের ছেলেদের পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হল:

"We, the students of Brahmavidyalaya, Santiniketan, desire to express our deep love and appreciation of your great work in the service of our countrymen in South Africa. We realise how you have been taking the message of "Shanti" of the Asram. Wherever you have been, and how you have made our beloved Asram your shelter and inspiration.

"We welcome you back amongst us after this long separation with great joy, and hope that in years to come you will be kept in health and strength to carry on the work of the Asram."

এণ্ড্রুজ সাহেব আশ্রমে যোগ দিলেন বটে কিন্তু বাইরের এতরকম কাজের সঙ্গে যোগ ছিল যে তাঁকে অনেক সময়ে আশ্রমের বাইরে বাইরে থাকতে হত। কিন্তু যখন তিনি আশ্রমে আসতেন আমাদের নানা কাজের সঙ্গে জড়িত থাকতেন। এমনকি আমাদের থাকবার একটা ঘরে (সত্যকুটিরে) তাঁর শোবার ও কাজ করবার একটা আস্তানা ছিল। সারাদিন নিরলস অধ্যবসায়ের সঙ্গে তাঁকে পড়াশুনা ও লেখার কাজ করতে দেখেছি। তারই মধ্যে আমাদের ইংরেজী ক্লাশ নিচ্ছেন, গুরুদেবের কাব্য ও ইংরেজী

লাতিন, গ্রীক সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন। এ সবের ফাঁকে ফাঁকে কখনও কখনও সিমলা, দিল্লী ঘুরে আসছেন। এরকম কর্মব্যস্ত লোক আমরা আর কখনও দেখি নি।

ইতিমধ্যে মিঃ গান্ধীর ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছেলেদের সঙ্গে এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সন সাহেবের চিঠিপত্র চলছে—তাঁরা আমাদের কথা তাদের লিখছেন—তারাও জবাব দিচ্ছে। পিয়ার্সন সাহেবকে লেখা একটা চিঠি নিচে তুলে দেওয়া হল:

Dated 23-7-1914

Dear Sir,

Thanks very much for your kind letter. You must have expected the vote of thanks much earlier. But as we have not been able to do so we hope you will forgive us.

We see by your kind letter that you have praised us a great deal, and have given us a high position in the minds of our countrymen. But we think that we are not worthy of it, for whatever we have done it was our duty to do so. Therefore we feel certain that we are not worthy of praise. But if anyone was worthy of praise it is surely you two gentlemen who have helped the Indian Community by your great work. And whatever you people have done it has been done unselfishly and with great love. You may depend on it that your work will ever stand fresh and vivid in our mind.

We feel that had you two gentlemen not come here and charmed the Government and the people by your love and kind deeds, there would never have been such an early settlement. Therefore we woe to you people all the love and thanks we can give you.

Before this letter reaches you, you will have known that father, mother & Mr. Kellenbach have left for London and from there they intend coming to the dear motherland. We also expect to leave for India by the 6th August to have once more the fun and play which we had with you. You will be glad to know that your pair of sandals are ready and

they are with father. Before closing this letter our best prayer to the Almighty is that may He give birth many more Andrews and Pearsons like yourselves to help the poor Indian Community.

Will you please convey our love to the boys of "Shantiniketan" and "Gurukula ?"

Yours affectionately,
Devdas, Prabhudas,
Seepoojan, Bhoga,
Coopooswamy,
Revashankar,
Ramdas.

ঐ সময়ে এণ্ড্রুজ সাহেবের কাছে তারা লিখেছিল :

"We are most anxiously and impatiently looking forward for the blessed day on which we will have the pleasure of reading a message from those noble and beloved brethren, who, although so far away from us, had encouraged us, through their brave and noble work in that dark and stormy time of our struggle."

এণ্ড্রুজ সাহেবের মধ্যস্থতায় দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের সঙ্গে মিঃ গান্ধীর একটা রফা হল। ভারতীয়দের মাথা-পিছু তিন পাউণ্ড অতিরিক্ত কর রদ হয়ে গেল। মিঃ গান্ধী সত্যাগ্রহ সংগ্রাম বন্ধ করে বিলাত চলে গেলেন সেখানে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা কায়েমী করার জন্যে। আর মনে মনে ইচ্ছা এবার দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগ করে ভারতবর্ষে ফিরে এসে বাস করবেন এবং দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করবেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন করে সরকারের বিপক্ষে লড়াইয়ে জয়লাভ করায় সারা ভারতে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু মুস্কিল হল তাঁর ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছেলেদের ও কর্মীদের নিয়ে। অধিকাংশ ছেলে পিতৃমাতৃহীন অনাথ। একটা কোনও নিদিষ্ট জায়গায় আস্তানা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত ঐ ছেলেগুলিকে ভারতবর্ষে এনে কোথায় রাখবেন এই হল সমস্যা। এদেশে এসে হরিদ্বারে গুরুকুল আশ্রমে কয়েকদিন কাটিয়ে দেখা গেল ; সেস্থান বিশেষ উপযোগী মনে হল না। তখন এণ্ড্রুজ সাহেবের মধ্যস্থতায় ফিনিক্স বিদ্যালয়ের

দল শান্তিনিকেতন আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এটা হল ১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে (১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩২১)। তখন সস্ত্রীক মিঃ গান্ধী বিলাতে।

এই সময়ে গুরুদেব মিঃ গান্ধীকে একখানি চিঠি লেখেন। এটাই বোধ হয় গান্ধীজিকে লেখা তাঁর প্রথম চিঠি :

Dear Mr. Gandhi,

That you could think of my school the right and likely place where your Phoenix boys could take shelter when they are in India has given me real pleasure and that pleasure has been greatly enhanced when I saw those dear boys in that place. We all feel that their influence will be a great value to our boys and I hope that they in their turn will gain something which will make their stay in Shantiniketan fruitful. I write this letter to thank you for allowing your boys to become our boys as well and thus form living link in the Sadhana of both of our lives.

Very Sincerely Yours
Sd/- Rabindranath Tagore

ফিনিক্স বিদ্যালয়ের দলকে থাকতে দেওয়া হল 'নতুন বাড়ি'র মাঝের কয়েকটা ঘরে। শান্তিনিকেতনের পূর্বসীমানায় বড় রাস্তার ধারে 'দেহলি' গৃহের সংলগ্ন কয়েকখানা খড়ের চালের ঘর এখনও আছে। এগুলোর নামই 'নতুন বাড়ি'। আশ্রম বিদ্যালয়ের একেবারে গোড়ার দিকে (১৩০৮-০৯ সালে) ঐ 'নতুন বাড়ি' তৈরি হয়েছিল গুরুদেবের পত্নী ও পরিবারের আত্মীয়-স্বজনের থাকবার জন্যে। কিন্তু মৃণালিনী দেবী ঐ বাড়িতে কোনও দিন বাস করেন নি—কারণ আশ্রমে আসবার অল্পদিন পরেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপর তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যাবার তিন মাসের মধ্যে তিনি দেহরক্ষা করেন। সেই থেকে 'নতুন বাড়ি' নামটি চলে আসছে এবং ঐ বাড়িতে আশ্রমের নানা কর্মী সপরিবারে বাস করেছেন, এখনও করছেন। এক সময়ে শিশুবিভাগের ছাত্ররাও থাকত। যা হোক, এই 'নতুন বাড়ি'তে গান্ধীজির ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকরা বাস করতে লাগলেন। ঐ বাড়ির উত্তর দিকের ঘরগুলোয় তাঁদের রান্নাবান্না আর উত্তরের বারান্দায় খাওয়া-দাওয়া হত। চাকর বামুন কেউ ছিল না, ছেলেরা ও শিক্ষকরা

একসঙ্গে সব কাজ করতেন। দলে ১৫।২০ জনের বেশি ছিল না। তাঁদের মধ্যে গান্ধীজির তিন পুত্র মণিলাল, রামদাস ও দেবদাস ছিলেন—আর ছিলেন ভাইপো মগনলাল। মণিলাল অল্পদিনের মধ্যে চলে যান। গান্ধীজির জ্যেষ্ঠপুত্র হরিলাল মাঝে কয়েকদিনের জন্যে এসেছিলেন। তিনি কখনও দক্ষিণ আফ্রিকায় যান নি—এদেশেই পিতামহীর কাছে মানুষ হয়েছিলেন।

সে সময়ে আমি ম্যাট্রিক ক্লাশের ছাত্র অর্থাৎ বড় ছেলেদের দলে। ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকদের সঙ্গে ভাব হতে দেরি হল না। মিঃ দত্তাত্রেয় নামে একজন ভদ্রলোক কিছুদিন আগে থেকেই আশ্রমে বাস করছিলেন—তাঁর সঙ্গে আমার বেশ পরিচয় ছিল—কারণ তিনি আমার সাহায্যে 'গোরা' বইখানা পড়তে শুরু করেছিলেন। তিনি গুজরাটবাসী—গান্ধীজির দলের সঙ্গে তিনি শীঘ্র ও সহজে মিশে গেলেন। মিঃ দত্তাত্রেয় বর্তমানে কাকা কালেলকার নামে খ্যাত। তাঁর বাংলা পড়ার উৎসাহ দেখে গান্ধীজির ছোট ছেলে দেবদাসও বাংলা পড়তে শুরু করেন। সেই সূত্রে তাঁর সঙ্গেও আমার বেশ ভাব হয়ে গেল। তার থেকে অন্যান্য সকলের সঙ্গে মিশে যেতে দেরি হল না।

আর একজন তামিল ভদ্রলোক কিছুদিন থেকে আশ্রমে বাস করছিলেন। তাঁকে আমরা মিঃ রাজাঙ্গম বলে জানতাম। গান্ধীজির বন্ধু রেঙ্গুন প্রবাসী ব্যারিস্টার ও ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত মেহ্‌তার তিনপুত্র ছগনলাল, মগনলাল ও রতিলাল এই সময়ে আশ্রমের ছাত্র ছিলেন। মিঃ রাজাঙ্গম এই ছেলেদের বিশেষ অভিভাবকরূপে দেখাশোনা করতেন—সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের অন্যান্য ছাত্রদেরও তত্ত্বাবধান করতেন। তাঁর মতো জিতেন্দ্রিয় নিষ্ঠাবান ব্যক্তির আমাদের উপর বিশেষ প্রভাব ছিল। মাঝরাত্রে ছেলেদের বিছানার পাশে ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াতেন। কেউ উপুড় বা চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে দেখলে তখনই অতি সন্তর্পণে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দিতেন, দরকার হলে গায়ে কাপড় ঢেকে দিয়ে আস্তে আস্তে চলে যেতেন। এই মিঃ রাজাঙ্গম ফিনিক্স বিদ্যালয়ের দলের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। যতদূর মনে পড়ে তাঁর সঙ্গে ঐ দলের আগে থেকেই যোগ ছিল।

ইতিমধ্যে গান্ধীজি ও তাঁর সহধর্মিণী কস্তুরাবাঈ ভারতবর্ষে ফিরে এলেন। বম্বে পৌঁছবার পর তাঁরা জানলেন যে তাঁদের ছেলেরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন আশ্রমে আছে। বম্বেতে কয়েকদিন থাকার পর

এণ্ড্রুজ সাহেবের কাছে খবর এল গান্ধীজি ১৭ই ফেব্রুয়ারী (১৯১৫) আশ্রমে এসে পৌঁছবেন। খবর পাওয়া মাত্র তাঁকে অভ্যর্থনা করে নেবার জন্যে আমরা আশ্রম পরিষ্কার করতে, পথঘাট তোরণ বেদী প্রভৃতি তৈরি করতে লেগে গেলাম। সময় বেশি ছিল না—মাত্র তিন দিন। দিনরাত্রি আমরা খাটতে লাগলাম। তখন এসব কাজ আমরা ছেলেরাই করতাম—সঙ্গে থাকতেন শিক্ষকরা নির্দেশ দেবার জন্যে। অল্পবয়স্ক যুবক শিক্ষকরা আমাদের সঙ্গে সমানে খাটতেন—ভাড়া-করা মজুর দিয়ে এ সব কাজ করানো হত না—এ সব ছিল আমাদের work for love আর শিক্ষার অঙ্গ।

গুরুদেব সেসময়ে আশ্রমে ছিলেন না। গান্ধীজি আসবেন খবর পেয়ে এণ্ড্রুজ সাহেবকে লিখলেন—তিনি আশা করেন মাননীয় অতিথিদের আশ্রমে যথাযোগ্য অভ্যর্থনার ব্যবস্থা হবে। হয়েও ছিল তাই। ১৭ই ফেব্রুয়ারী বিকালে বড় বড় ছাত্র অধ্যাপকদের সঙ্গে স্টেশনে গেলাম। ফিনিক্স বিদ্যালয়ের দলও গেল। আমরা স্টেশনে পৌঁছে দেখি ট্রেন এসে পড়েছে—গান্ধীজি কস্তুরাবাঈ ট্রেন থেকে নেমে বাইরে এসে গেছেন। অতি সাদাসিধা পোশাক, মাথায় পাগড়ি, খালি পা—গান্ধীজিকে দেখে আমরা খুবই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। তাঁদের প্রণাম করে অভ্যর্থনা করলাম। দীপেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অতিথিদের আসবার জন্যে তাঁর জুড়ি ঘোড়ার ফিটন পাঠিয়েছিলেন কিন্তু গান্ধীজিরা কেউ গাড়ি চড়তে রাজী হলেন না। এণ্ড্রুজ, পিয়ার্সন ও অন্যান্য অধ্যাপকদের সঙ্গে হেঁটেই আশ্রমের দিকে রওনা হলেন। আমরা পিছু পিছু আসতে লাগলাম। তখন বোলপুরের রাস্তা অতিশয় খারাপ ছিল—লাল ধুলোর মধ্যে পা ডুবে যেত। না ছিল বাস, না ছিল রিক্সা, না ছিল মোটর গাড়ি বা ট্যাক্সি—গরুর গাড়ি ছিল একমাত্র যান।

নীচু বাংলার সামনাসামনি আসতেই গান্ধীজি সস্ত্রীক এণ্ড্রুজ সাহেবের সঙ্গে 'বড়দাদা' পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। সেখান থেকে সকলে আশ্রমের প্রবেশদ্বারে পৌঁছলেন। আমরা দেবদারু ও আম্রপল্লব দিয়ে যে তোরণ তৈরি করেছিলাম সেইটেই হল সেদিনকার প্রবেশদ্বার। তখনও কোনও পাকা ফটক বা পাকা রাস্তা আশ্রমের মধ্যে ছিল না। চারদিকে তারের বেড়ার ঘের দেওয়ারও দরকার হয় নি। বর্তমান হিন্দী-চীনা-শিক্ষা-বিদ্যাভবনের সামনে যে বড় রাস্তাটি

এখন দেখা যায়, তখন সবেমাত্র তার জল্পনা-কল্পনা চলছে। কল্পিত রাস্তার দুধারে আমরা নিজের হাতে অনেক চারা গাছ পুঁতেছিলাম। এখন সেগুলো মহীরুহ। নেপালচন্দ্র রায় মহাশয়ের উদ্যোগে এই ব্যবস্থা হচ্ছিল বলে আমরা এই রাস্তার নাম দিয়েছিলাম 'নেপাল সড়ক'।

যাই হোক, শাল গাছের তলা দিয়ে পায়ে-চলা-পথে তিনটি ছোট পেরিয়ে গান্ধীজি সদলবলে আমবাগানের বেদীমূলে পৌছলেন। আশ্রমের প্রথামতো মাল্য চন্দন ধূপধুনার সৌগন্ধে আমরা তাঁদের অভ্যর্থনা করলাম। ক্ষিতিমোহনবাবু, দত্তাত্রেয় ও রাজাঙ্গম বৈদিকমন্ত্রে স্বাগত জানালেন। দিনুবাবু গানের দল নিয়ে গান করলেন। অসিতবাবু নিজের হাতের আঁকা ছবি উপহার দিলেন। গান্ধীজি আমাদের আন্তরিকতাপূর্ণ আড়ম্বরশূন্য দেশী প্রথার অভ্যর্থনায় খুবই খুশি হলেন। সেকথা তিনি পরে তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন।

তাঁর ফিনিক্স বিদ্যালয়ের বালক ও কর্মীদের সঙ্গে একই ব্যবস্থায় নতুন বাড়িতে বাস করতে লাগলেন। কিন্তু বেশিদিন আশ্রমে ছিলেন না তা মনে আছে।

এত বছর পরে সব কথা পর পর মনে নেই—তবে দু-একটা ছবি এখনও চোখের উপর ভাসছে। একদিন সন্ধ্যাবেলা কুপুস্বামী নামে তাঁর বিদ্যালয়ের একটি ছেলের খুব পেটব্যথা হল। একটা তক্তাপোশের উপর কম্বলপাতা বিছানায় শুয়ে যন্ত্রণায় সে খুব কষ্ট পাচ্ছে আর তার পাশে গান্ধীজি বসে তার পেটে কাদার ঠাণ্ডা পুলটিস বেঁধে দিচ্ছেন আর গভীর স্নেহ ও অপরিসীম ধৈর্যের সঙ্গে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন—এই দৃশ্যটি এখনও মনের চোখে দেখতে পাচ্ছি। তাঁর চিকিৎসায় অল্পকালের মধ্যে ছেলেটি সুস্থ হয়ে উঠল।

'নতুন বাড়ি'র পশ্চিম দিকে যে আমবাগান আছে, তারই একটা গাছের ছায়ায় পিয়ার্সন সাহেব তাঁর ক্লাশ নিতেন। গান্ধীজি আশ্রমে পৌঁছবার ২।৩ দিন পরের কথা হবে। ঐ গাছতলায় একদিন সকালবেলা পিয়ার্সন সাহেব আমাদের ইংরেজীর ক্লাশ নিচ্ছিলেন। যে বইখানা তিনি আমাদের পাঠ্য হিসাবে দিয়েছিলেন সেটির নাম এখনও মনে আছে—F… on the Fjord—নরওয়ে দেশের পাহাড়ে নদীর উপরে ভ্রমণের চিত্তা… কাহিনী। এমন সময়ে দেখা গেল 'শান্তিনিকেতন' বাড়ির (তখন অতিথি

গৃহ) দিক থেকে গান্ধীজি একলা আসছেন—খালি পা, গায়ে পাতলা একখানা চাদর আলগোছে ফেলা। 'শান্তিনিকেতন' বাড়ির উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা বাড়িতে তখন ছিল শান্তিনিকেতন পোস্টঅফিস (এখন সেখানে শিল্পসদনের দোকান)। পোস্টঅফিস থেকে 'নতুন বাড়ি'তে যাবার পথে আমতলায় আমাদের ক্লাশ হচ্ছিল। গান্ধীজি যেতে যেতে পিয়ার্সন সাহেবকে ক্লাশ নিতে দেখে ক্লাশের কাছে এগিয়ে এসে থামতেই আমরা সকলে দাঁড়িয়ে উঠে নমস্কার করলাম; পিয়ার্সন সাহেব তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে হাতের বইখানা গান্ধীজির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন: "You please take this class।" গান্ধীজি অম্লান হেসে বললেন: "No, no, Mr. Pearson. I will always learn English from an Englishman. You better go on—I will sit with the boys"—বলেই আমাদের একটা আসনে বসে পড়লেন। পড়া যেমন চলছিল চলতে লাগল। কিছুক্ষণ পড়া চলার পর পোস্টঅফিস থেকে শশী পিয়ন এক টেলিগ্রাম এনে গান্ধীজির হাতে দিল। টেলিগ্রামখানা পড়েই গান্ধীজি বলেন: "Gokhale is no more ! I must go at once !" বলেই তিনি ঘরের দিকে হন হন করে চলে গেলেন।

আশ্রমময় গোখ্‌লের মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়তে দেরি হল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঢং ঢং করে সভার ঘণ্টা পড়ল—আর সকল আশ্রমবাসী আমবাগানে মিলিত হলেন। গান্ধীজি গোখ্‌লের বিষয়ে কিছু বলে বললেন: "আমি তাঁর কাছে প্রতিশ্রুত যে তাঁর অবর্তমানে তাঁর Servants of India Society-র কাজের পরিদর্শনে সহায়তা করব—তাই আমি আজই পুণায় রওনা হচ্ছি।" তারপর আমাদের অধ্যাপক নেপালবাবু গোখ্‌লের জীবন ও কাজের কথা আমাদের বললেন। দেশের জন্যে তিনি কি করেছেন, তাঁর Servants of India Society কি এবং তার আদর্শ কি—সব কথাই আমরা জানতে পারলাম।

বিকালের গাড়িতে গান্ধীজি ও কস্তুরাবাঈ পুণা রওনা হয়ে গেলেন, আমরা তাঁদের ট্রেনে তুলে দিয়ে এলাম। মাথায় পাগড়ি, গায়ে ফতুয়া, পায়ে চপ্পল—শীর্ণদেহ, বলিষ্ঠ পদক্ষেপ—এখনও যেন চোখের উপর ভাসছে। সে তারিখটা ছিল ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯১৫—আশ্রমে মাত্র তিনদিন ছিলেন। গান্ধীজির বয়স তখন হবে ৪৫ বছর। এবার গুরুদেবের সঙ্গে তাঁর দেখা

হল না। গুরুদেব তখন কলকাতায় ছিলেন। গান্ধীজি পুণা রওনা হলে। দিন দুই পরে গুরুদেব ফিরে এলেন। তখন তিনি সুরুলের কুঠি বাড়িতে থাকতেন। একটি নতুন নাটিকা ও গান লিখতে ব্যস্ত। তারই গানের আভাস মাঝ মাঝে আমরা পাই। একদিন গুরুদেব নাটিকাটি আমাদের কাছে পড়ে শোনালেন। প্রথমে তার নাম ছিল 'বসন্তোৎসব', কিন্তু পরে 'ফাল্গুনী' নামে পরিচিত।

দিন পনরো পরে ৬ই মার্চ, ১৯১৫ গান্ধীজি ও কস্তুরাবাঈ আশ্রমে ফিরে এলেন। এইবার গুরুদেবের সঙ্গে গান্ধীজির প্রথম সাক্ষাৎকার হল। এর থেকে দুজনের বন্ধুত্ব কীভাবে কোন্ পথে গেছে তা তাঁদের জীবনীপাঠক মাত্রেই জানেন।

ইতিমধ্যে আমরা শুনলাম আমাদের সব কাজ নিজেদেরই করতে হবে—জলতোলা, রান্না, বাসনমাজা, তরকারিকাটা, বাটনাবাটা সব কাজ—যেগুলো আগে ঠাকুর-চাকররা করত—এখন ঠাকুর-চাকর থাকবে না। গান্ধীজি নাকি এই প্রস্তাব করেছেন এবং গুরুদেব মত দিয়েছেন। অধিকাংশ শিক্ষক ও কর্মী, বিশেষত যাঁদের কম বয়স, এই প্রস্তাবে খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন—কেবল জগদানন্দবাবু, কালীমোহনবাবু, শরৎবাবু প্রভৃতি কয়েকজন শিক্ষক এই ব্যবস্থার অযৌক্তিকতা হৃদয়ঙ্গম করে দূরে সরে রইলেন। আড়াইশো তিনশো লোকের রান্না, রান্নার বাসনকোসন মাজা—জলতোলা প্রভৃতি ভারী কাজ করে পড়াশুনা করা ও পড়ানো যে সম্ভব নয় তা তাঁরা আগে থেকেই বুঝেছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষক ও কর্মী এই ব্যবস্থা মেতে ওঠাতে খুব উৎসাহের সঙ্গে ঠাকুর-চাকরদের বিদায় দিয়ে সকলে এই কাজে লেগে গেলেন। কুটনোকোটা, বাটনাবাটা, জলতোলা, বাসনমাজা, কয়লাভাঙা নানা কাজে ছাত্র-শিক্ষক ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। যেদিন এই ব্যবস্থার সূত্রপাত হয় সে তারিখটা ছিল ১০ই মার্চ ১৯১৫—প্রতিবৎসর সেইজন্য ১০ই মার্চ তারিখে আশ্রমে 'গান্ধী-পুণ্যাহ' উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে।

নেপালবাবু ও ক্ষিতিমোহনবাবু অতিরিক্ত মোটা হয়ে যাচ্ছেন বলে গান্ধীজির পরামর্শমতো খাদ্যের নানারকম ছাঁটাই করতে করতে রোগা হওয়ার পরীক্ষা শুরু করলেন। শেষকালে তাঁরা এতই দুর্বল হয়ে পড়লেন যে তাঁদের সবল ও সুস্থ করে তুলতে রীতিমতো সময় লাগল।

এতদিন ঠাকুরচাকরের হাতে রান্নাঘর ও খাবার ঘরের ভার ছিল।

আমরা তো ঘণ্টা পড়লে লাইন করে নিজেদের থালা-বাটি নিয়ে খেতে যেতাম—আর খাওয়ার পর কুয়োতলায় গিয়ে নিজেদের থালা-বাটি মেজে নিতাম—চাকররা চৌবাচ্চা ভরে জল তুলে রাখত। রান্না ও খাবারঘরের বহুদিনের সঞ্চিত ময়লা চোখে পড়ত না। এখন নিজেরা কাজ করতে নেমে চারিদিকের নোংরা চোখে পড়তে লাগল। খাবারঘর বলতে কী ছিল বললে এখনকার ছাত্রছাত্রী তা কল্পনাও করতে পারবে না—শরকাঠির দেওয়াল-ঘেরা, টিনের ছাদওলা লম্বা একটা জায়গা ছিল আমাদের খাবারঘর—তার পাশে মাটির দেয়াল, খড়ের চাল দেওয়া একটা ঘরে ছোট ছেলেরা খেত—এই ঘরটায় আগে চাকররা থাকত—তাই এটার নাম ছিল চাকরদের ঘর। পরে ছেলের সংখ্যা বেশি হওয়ায় এই ঘরটা হয় শিশু-বিভাগের ছেলেদের খাবার জায়গা। তবে দুটো খাবার ঘরের মেঝে ছিল পাকা—সিমেণ্ট-করা—কিন্তু মেঝের উপর কতকালের শুকনো ডাল ভাত তরকারির প্রলেপ পড়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। এখনও চোখের উপর ভাসছে—হাফপ্যাণ্টপরা, গেঞ্জিগায়ে, পিয়ার্সন সাহেব কী নিষ্ঠার সঙ্গে বহুদিনের সঞ্চিত ক্লেদ চেঁছে পরিষ্কার করতে করতে দারুণ গ্রীষ্মে গলদঘর্ম হয়ে লাল হয়ে উঠেছেন। আর একদিকে সন্তোষদা, নগেন গাঙ্গুলী মশায়, অসিতবাবু, প্রমোদাবাবু, প্রভাতবাবু প্রভৃতি শিক্ষকগণ রান্নার বড় বড় ডেক, কড়াই, গামলা মাজা নিয়ে বড় ছেলেদের সঙ্গে একযোগে হিমসিম খাচ্ছেন—এ দৃশ্যও ভোলবার নয়। বেগুন কেন ঝোলের মধ্যে ডুবছে না এই নিয়ে সকলের চিন্তার অন্ত ছিল না।

সকলকে কাজে লাগিয়ে দিয়ে গান্ধীজি ঘুরে ঘুরে কাজ দেখে বেড়াচ্ছেন। দেখে গেলেন রান্নাঘরের সামনে নালার মধ্যে বাসি ভাত তরকারি পড়ে রয়েছে। পরিষ্কার করে ফেলার জন্যে দু-একজনের দৃষ্টি তার প্রতি আকৃষ্ট করে তিনি অন্যদিকে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে দেখেন—নালার ভাত তেমনি রয়েছে। কাউকে কিছু না বলে নিজেই গান্ধীজি হাত দিয়ে ভাত ও ময়লা তুলতে বসে গেলেন। তখন অন্য সকলে এসে তাঁকে কোনও রকমে নিবৃত্ত করে তাড়াতাড়ি নালাটা পরিষ্কার করে ফেলল। তখন বোঝা গেল এই লোকটির কাছে কাজে শৈথিল্য চলবে না—সবাই সাবধান হয়ে গেল। কখন কোথায় কি ঘটে তার জন্যে সকলে ব্যস্ত হয়ে রইল।

ঠাকুরচাকর তো বিদায় নিয়েছে—এমনকি মেথরও। তখন চারদিকে খোলা মাঠ ও অবারিত খোয়াই থাকাতে অধিকাংশ আশ্রমবাসীর কোনও কাজের জন্যে মেথর ছিল না বটে তবে আশ্রমসীমানার বাইরে রান্নাঘরের পশ্চিমে পাশাপাশি তিনটে খাটা পায়খানা ছিল—কোনও কোনও শিক্ষক এবং রোগীরা অসময়ে ব্যবহার করতেন। মেথর চলে যাওয়াতে পায়খানা পরিষ্কার করা নিয়ে সমস্যা হল। সকাল থেকে মেথরের অভাবে সা পায়খানার বালতি যেমন তেমনি পড়ে রয়েছে। গান্ধীজি কাউকে কিছু না বলে নিজেই বালতি টেনে নিয়ে পরিষ্কার করতে চললেন। সন্তোষদা এবং আরও কেউ কেউ ছুটে গিয়ে তাঁর হাত থেকে বালতি নিয়ে পরিষ্কার করে আনলেন। সকলেই বুঝল এ লোকটির সঙ্গে কাজ করা কত শক্ত, না-করা আরও মুস্কিল।

আমরা যে-সময়ে গান্ধীজির নেতৃত্বে স্বাবলম্বী হবার প্রাণপণ চেষ্টায় মেতে উঠেছি, গুরুদেব সে-সময়ে আশ্রমের মধ্যে বাস করতেন না—তিনি থাকতেন সুরুলের কুঠিবাড়িতে। খবর সব তিনি রাখতেন, শুধু নিজে দূরে রইলেন। সন্ধ্যার দিকে আশ্রমে এসে বড় ছেলেদের ডেকে পাঠালেন। বেণুকুঞ্জের বারান্দায় আমরা সব জড়ো হলাম—মাস্টারমশায়রাও এলেন। যে-কথাগুলি গুরুদেব বলেছিলেন তার যে-টুকু মনে আছে তা এই : "মিঃ গান্ধী তোমাদের সব কাজ নিজেদের করতে বলেছেন—তোমরাও শুনছি খুব উৎসাহের সঙ্গে লেগে গেছ। এটা ভালোই হয়েছে। তবে এর মধ্যে অনেকখানি পরিশ্রম আছে এবং কিছুটা কষ্ট ও অসুবিধা যে নেই তা নয়। যিনি নিজে বরাবর শারীরিক পরিশ্রম করেছেন এবং অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন, তিনি আজ তোমাদের পরিশ্রম ও কষ্ট করার কাজে প্রবৃত্ত করেছেন—এটাই হয়েছে সমীচীন। আমি এ ব্যবস্থা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করলেও তোমাদের কখনও এরকম কাজে প্রবৃত্ত হতে বলতে পারি নি তার কারণ আমি নিজে কখনও হাতেকলমে শারীরিক পরিশ্রম করতে অভ্যস্ত নই—তাই তোমাদের কাছে বলার অধিকার আমার নেই। মিঃ গান্ধী যে তোমাদের বলেছেন সেটা যুক্তিযুক্ত হয়েছে। তোমাদের পড়াশুনার হয়তো এতে কিছু ক্ষতি হবে কি নিজের কাজ নিজে করবার যে অভিজ্ঞতা তোমরা এই তরুণ বয়সে করছ তা তোমাদের জীবনে নিশ্চয়ই সার্থক হবে এ আমি বিশ্বাস করি।" এগুলো ঠিক গুরুদেবের নিজের ভাষা যে নয় তা বলাই বাহুল্য। গত

বছর ধরে যে কথাগুলো আমার মনের উপর রেখাপাত করে আছে উপরের কথাগুলো হল তারই প্রতিক্রিয়া।

সে সময়ে আশ্রমে ব্রাহ্মণ শিক্ষক ও ছাত্ররা 'জাত' রক্ষা করে আলাদা পংক্তিতে ব্রাহ্মণ পাচকের রান্না খেতেন, অব্রাহ্মণ কোনও খাদ্য স্পর্শ করত না। যখন স্বাবলম্বন প্রথা শুরু হল তখন রান্নাঘরে যে-সব শিক্ষক ও ছাত্র 'জাত' মানতেন না তাঁরা রান্না করতে লেগে গেলেন। সুতরাং যে-সব ব্রাহ্মণ শিক্ষক ও ছাত্র আলাদা ব্রাহ্মণের রান্না খেতে অভ্যস্ত ছিলেন তাঁদের জন্যে হরিবাবু ও শাস্ত্রীমশাই যে আলাদা বাড়িতে থাকতেন তারই একটা ঘরে রান্না হতে লাগল। খুব সম্ভব সেখানে ব্রাহ্মণ পাচক নিযুক্ত থাকল—ঠিক মনে নেই। শাস্ত্রীমশাই চিরদিন স্বপাক আহারে অভ্যস্ত, তাঁর সম্বন্ধে এই স্বাবলম্বন নীতির কোনও প্রশ্ন ছিল না। ব্রাহ্মণ শিক্ষক ও ছাত্রদের আলাদা রান্না খাওয়া নিয়ে গুরুদেবের সঙ্গে গান্ধীজির আলোচনা এমনকি মতদ্বৈধ হয়, সেকথা তখন আমরা টের পাই নি। রবীন্দ্রজীবনীপাঠে এখন জানতে পারি।

যা হোক, আমাদের স্বাবলম্বন প্রথা চালু করে দিয়েই গান্ধীজি ও কস্তুরাবাঈ ১১ই মার্চ আশ্রম থেকে রওনা হলেন রেঙ্গুন যাবার জন্যে। আমরা তখন রান্নাবান্না, বাসনমাজা, বাটনাবাটা, কয়লাভাঙ্গা, জলতোলা প্রভৃতি নিয়ে এতই ব্যস্ত যে কখন তাঁরা চলে গেলেন তা টের পাই নি। দিন কুড়ি পরে এপ্রিলের গোড়ায় তিনি রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসেই তাঁর বিদ্যালয়ের দলকে নিয়ে হরিদ্বার চলে গেলেন। সেখানে সেবার কুম্ভমেলা হবার কথা—লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ হবে। দেশের লোকের সাক্ষাৎ পরিচয় পাওয়া যাবে এই আশাতেই গান্ধীজি সদলবলে সেখানে চললেন। কোনও বিদায়সভা হয়েছিল কিনা মনে নেই। তবে ট্রেনে একখানা থার্ডক্লাশ কামরায় তাঁরা সকলে উঠে বসেছেন—ট্রেন ছেড়ে দিল—আর রামদাস, দেবদাস, কৃপুস্বামী, প্রভুদাস প্রভৃতির সঙ্গে আর দেখা হবে না এই বেদনা-বোধটুকু মনে আছে। আর দেখাও হয় নি। তিন-চার মাসের মেলামেশা জানাশোনার অবসান হল।

গান্ধীজি যে-কাজে আমাদের লাগিয়ে দিয়ে গেলেন, তা আমরা প্রাণপণে করে যেতে লাগলাম।

আশ্রমে আমাদের খাওয়াদাওয়া ছিল খুবই সাদাসিধে। নিরামিষ তো

বটেই—মাংস, মাছ, ডিম কিছুই খাওয়া হত না। ছাত্র শিক্ষক এবং আশ্রমের অন্যান্য কর্মী সকলেই রান্নাঘরে একই আহার্য গ্রহণ করতেন। ভাত ডালের সঙ্গে একটা তরকারি আর আলুর সঙ্গে কখনও পটল, কখনও ওল, কখনও লাউ, কখনও ডালের বড়া দিয়ে একটা ঝোল। মাঝে মাঝে টক আর ঘোল বা দুধ। সে সব আমরা পরম আনন্দে খেয়ে তুষ্ট হতাম। রান্নাঘরের দেওয়ালে লেখা ছিল: "অন্নং ন নিন্দেৎ"—রান্না খারাপ হয়েছে কি মনোমতো হয় নি বলে অনুযোগ করেছি বলে মনে পড়ে না। সকাল বিকাল জলখাবার ছিল নানারকমের—ঠাকুরচাকরে দিত—কখনও লুচি ডাল, কখনও মোহনভোগ, কোনও দিন বা সিঙাড়া কি গজা।

ঠাকুরচাকর যখন চলে গেল তখন দুবেলা ডাল ভাত তরকারি ঝোল রাঁধতেই আমাদের সব সময় যেত ও পরিশ্রম হত। দুবেলা আগের মতো জলখাবার করার সময় ও অভিজ্ঞতা আমাদের ছিল না। তাই যে-সব জিনিস রান্না না করে খাওয়া যায়, যেমন চিড়ে, মুড়ি, ছাতু প্রভৃতি খাওয়ার ব্যবস্থা হল। বোলপুর বাজারে আমাদের দরকার মতো ছাতু, চিড়ে নেওয়া ভার। উৎসাহী তরুণ শিক্ষক প্রভাতবাবু কলকাতা থেকে ছাতু, চিঁড়ে বস্তাভরে কিনে আনলেন। পরের দিন সকালে দই চিনি দিয়ে খুব উৎসাহের সঙ্গে ছাতু মাখা হল—কিন্তু মুখে দিয়েই সকলে থু থু করে উঠল—গলাধঃকরণ করা গেল না। তখন বোঝা গেল ছাতু বলে বস্তাবোঝাই যা এসেছে তা বেশন, ছাতু নয়। নিজেদের হাতে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থায় যে-সকল ছোটবড় গণ্ডগোল মাঝে মাঝে দেখা দিতে লাগল—এটি তার অন্যতম।

মিঃ গান্ধীর ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকদের খাওয়াদাওয়া ছিল আরও সরল। দুপুরের আহার ছিল মোটা মোটা আটার রুটি আর তার সঙ্গে হয় ডাল কিংবা তরকারী—তার বেশি কিছু নয়। আর সন্ধ্যায় ছিল ফলাহার বা ছাতুমাখা বা ঐরকম সামান্য কিছু। গান্ধীজির উপদেশে তাঁদের দলে মিঃ কোটয়াল বলে একজন মহারাষ্ট্রীয় শিক্ষক-কর্মী ছিলেন। তাঁকে সকলে "আন্না" বলে ডাকতেন তাই আমরাও "আন্না" বলতাম। রাজাঙ্গম, "আন্না" আর গান্ধীজির ভাইপো মগনলালের পরামর্শমতো সন্তোষদা দশ-বারো জন বড় ছাত্র নিয়ে খাদ্যসংস্কারক দল গঠিত করলেন। নবাগত তরুণ শিক্ষক প্রমোদাবাবু

এইদলে যোগ দিলেন। আমরা ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মতো খাওয়া শুরু করলাম। তাদেরই রান্নাঘরের পাশের একটা ঘরে হল আমাদের রান্নাঘর। রাজাঙ্গম, "আন্না" হলেন আমাদের পরামর্শদাতা। সকালে ক্লাশের ফাঁকে ফাঁকে পালা করে এসে মোটা মোটা আটার রুটি হাতে গড়ে চাকি বেলুনের ব্যবহার না করে এবং আগুনের উপর না সেঁকে কেবল তাওয়ায় সেঁকে রুটি তৈরি করতাম। এক টুকরো ন্যাকড়া দিয়ে গরম তাওয়ার উপর রুটিটা চেপে ধরলে ফুলে ফুলে উঠত এখনও মনে আছে। তার সঙ্গে কোনও দিন শুধু ডাল, কোনও দিন বা শুধু একটা তরকারী। যতদূর মনে পড়ে নুন ও হলুদের গুঁড়ো ছাড়া আর কোনও মসলা ছিল না। সামান্য পরিমাণ তেল ও ঘি ব্যবহার করা হত। এ সব রসদ রান্নাঘরের সরকারী ভাড়ার থেকে আনা হত। সন্ধ্যার উপাসনার পরই রাত্রের খাওয়া শেষ করতে হত। ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছেলেরাও তাদের সান্ধ্যভজনের পর রাত্রির আহার শেষ করত। তাদের মতো আমাদের আহার্য ছিল দুটো কাঠালিকলা, গোটা দুই যজ্ঞি ডুমুর, ১০।১২ টা গোটা কাঁচা চিনাবাদাম, কখনও বা গোটা ২।৪ পিণ্ডি খেজুর। এই সামান্য আহারে আমাদের মতো উঠতি বয়সের ছেলেদের চলবে কেন? তার উপর সারাদিন পরিশ্রম। আমাদের দলের ছেলেরা বড় রান্নাঘরের কাজ থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল—আমাদের নিজেদের কাজে সময় কম যেত না। যাহোক রাত্রে ক্ষিধেয় আমরা অস্থির হয়ে পড়তাম। এইরকম ফলাহারে মাঝে মাঝে পেটের অসুখও দেখা দিতে লাগল। কিন্তু খাদ্য সংস্কার খুব বেশিদিন চলেছিল বলে মনে হয় না। ফিনিক্স বিদ্যালয়ের দল হরিদ্বার রওনা হয়ে যাওয়ার ২।৪ দিন পরেই বোধহয় আমাদের পরীক্ষা উঠে গিয়েছিল—ঠিক মনে পড়ছে না। কিন্তু স্বাবলম্বন প্রথা মাস দেড় দুই চলেছিল। ২৫শে বৈশাখ (৭ই মে ১৯১৫) গুরুদেবের জন্মদিনের পর আমাদের বিদ্যালয়ের গ্রীষ্মের ছুটি হয়ে গেল। ছুটির পর আর এ ব্যবস্থা চলে নি। মনে পড়ছে ছুটির আগে 'ফাল্গুনী' অভিনয় যথারীতি হয়েছিল।

তখন রান্নাঘরে এক এক বেলায় আড়াইশো তিনশো লোক আহার গ্রহণ করত। ছাত্র-শিক্ষক ছাড়া আশ্রমের সকল কর্মী তখন রান্নাঘরে খেতে পেতেন, তার জন্যে কাউকে কোনও পয়সা দিতে হত না। এত লোকের জন্যে রান্না-বান্না, বড় বড় হাঁড়ি কড়াই মাজা, জলতোলা প্রভৃতি কাজ ১৪।১৫।১৬ বছরের ছেলেদের পক্ষে দিনের পর দিন সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত করা সোজা

ছিল না। যদিও মাস্টারমশাইরা আমাদের সঙ্গে সমস্ত কাজে যথাসাধ্য সাহায্য করতেন—তবু ঠাকুরচাকর ছাড়া এ কাজ করা সম্ভবপর মনে হল না—তার উপর ছিল সকাল দুপুরে ক্লাশ করা। গ্রীষ্মের ছুটির পর আবার ঠাকুরচাকর ফিরে এসে নিজের নিজের কাজে বাহাল হল।

তবে আমাদের এই দেড়-দুমাসের অভিজ্ঞতার যে কোনও মূল্য ছিল না আমাদের জীবনে তা বলতে পারি নে। এই উদ্যোগকে স্মরণ করে প্রতিবছর ১০ই তারিখে শান্তিনিকেতনে গান্ধীদিবস পালিত হয়—সেদিন ঠাকুরচাকর সবাই একবেলা ছুটি পায়—বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীরা সেদিন মনের আনন্দে রান্নাবান্না কাজকর্ম করে—এখন বড় বড় ছেলেমেয়ের অভাব নেই—তার উপর মাত্র একবেলার কাজ—বিশেষ কিছুই মনে হয় না—অনেকটা পিকনিক করার মতো হেসেখেলে দিনটা কেটে যায়।

যিনি আমাদের স্বাবলম্বী করতে চেয়েছিলেন সেই গান্ধীজিকে এবং যিনি কখনও কোনও পরীক্ষা করতে পেছপা হতেন না সেই গুরুদেবকে 'গান্ধী-পুণ্যাহে' স্মরণ করে প্রণাম জানাই। আর যে দুজন মহাপ্রাণ ইংরেজের মধ্যস্থতায় এই দুই পুরুষের মিলন সম্ভবপর হয়েছিল সেই এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সন সাহেবকে এই সঙ্গে স্মরণ করি ও প্রণাম নিবেদন করি।

বলা বাহুল্য এর অনেক কথাই ৪৫ বছরের আগেকার স্মৃতি থেকে লেখা—তবে সেই সময়কার আমাদের ইংরেজী হাতের লেখা 'The Asram' নামক পত্রিকার পাতা উল্টে অনেক কথা মনে পড়ল। পত্রিকাগুলির কয়েকখণ্ড রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত আছে। আরও বিজ্ঞ পাঠকদের কাছে বলা নিষ্প্রয়োজন যে অনেক কথা রবীন্দ্রজীবনী পড়তে পড়তে ঝালিয়ে নেওয়া হয়েছে।

আমার কাছে একটি অমূল্য সম্পদ গত ৪৫ বছর ধরে আছে তার বিবরণ বলে আমার এই স্মৃতিকথা শেষ করব। হরিদ্বারের কুম্ভমেলার পরে গান্ধীজি আমেদাবাদের কাছে সাবরমতিতে তাঁর আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন—সে কথা সকলেই জানেন। ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পূজার ছুটির সময় এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সন সাহেব সাবরমতি আশ্রমে গিয়ে জুটেছিলেন। সেখান থেকে আশ্রমবাসী সকলে একখানা ছবির কার্ডে প্রত্যেকে নাম সই করে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। গান্ধীজি তখন হিন্দী শিখতে শুরু করেছেন মাত্র, তিনি

হিন্দীতে নাম সই করেছেন। দেবদাস আমার কাছে বাংলা শিখতেন বলে তিনি বাংলায় নাম লিখেছেন।

Ahmedabad
Greetings from us all
Chhotolal
पार्थसारथी
शिवपूजन
मो. क. गांधी
Magan bhai
Coopooswamy
Naranswamy
Phabhudas
দেবদাস
कस्तूर बाई
Maganlal Gandhi
Ramdas M. Gandhi
Balasubrai Rao
Anna
C. F. Andrews
W. W. Pearson

25 Sept
1915

Sj Surit Kumar Mukherjee
Shantiniketan
Bolpur
Bengal

প্রবন্ধটিতে পরলোকগত লেখক শান্তিনিকেতনের আশ্রমের একটি পরিচ্ছেদ সম্বন্ধে কিছু তথ্য পরিবেশন করেছেন। পরিচ্ছেদটি ক্ষুদ্র হলেও বিশিষ্ট। তথ্যগুলি সবই নতুন না হলেও কিছু কিছু নতুন এবং লেখকের মতামত নির্বিশেষে জিজ্ঞাসুদের পক্ষে স্মরণীয়, তথ্য হিসেবে মূল্যবান—সম্পাদক।

দেবদারু, ডবলডেকার এবং বিনোদ

অরূপ বসু

"দরজাটা দিয়ে দাও," মীরা বলল, "নীলা রইল, আমার দেরি হলে ওকে চা করে দিতে ব'লো।"

বিনোদ বলল, "আচ্ছা।" তারপর বাইরে এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে ওর অভ্যেসমতো মীরার হাঁটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পেছন থেকে দেখল; বরাবরই মীরা একটু পা টেনে টেনে হাঁটে, এখন ডান হাতে হলদে রঙের একটা মেয়েলী থলে, ডান হাতটা রোগা যেন শুকিয়ে গেছে। পিঠটার ঢালও আগের মতো নেই। কথাটা মনে হওয়ার পরই বিনোদ বিড়ি ধরাল, তারপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসে চৌকিতে বসল। বিড়ির গন্ধ মীরার সহ্য হয় না, ভাগ্যিস সে এখন নেই।

মীরা চলে যাওয়ার পর বাড়িটা সত্যি সত্যি খালি হয়। দুপুর বেলায় বাড়ি এত নির্জন! কলের মুখ শুকনো, পেতলের গায়ে বিষাদ ভরা, আর এঁটো বাসনপত্তরগুলো মাছের সরু সরু কাঁটায় ভরে গিয়ে নির্জন হয়ে যায়।

ঘরের জানালা তিনটে। তার মধ্যে দুটোই বন্ধ করা থাকে নর্দমার আর আবর্জনার গন্ধের জন্যে। এখন তিনটেই বন্ধ ছিল। দেওয়ালের রঙ এমনিতেই বহু পুরনো চটে যাওয়া, ম্যাটমেটে, বিশ্রী, দম আটকানো এক-রকমের হলদে। দেওয়ালের দিকে তাকালেই পচা ফলের খোসার কথা মনে পড়ে যায়। সেই দেওয়ালের মধ্যে ছায়া, আর ছায়ার মধ্যে দেওয়াল ঘড়িটা হৃৎপিণ্ডের মতো সর্বক্ষণ আওয়াজ করে চলেছে। এই দেওয়ালটা বিনোদের সহ্য হয় না। কেননা ওদিকে তাকালেই রোজকার অস্বস্তিটা ফিরে আসে। অবশ্য নিয়মিত বলে অস্বস্তিটাও তার অনেকখানি অভ্যেস হয়ে এসেছে, তবু রেহাই পাবার অনেক চেষ্টা করেছিল সে। কিন্তু পোষা বেড়ালের মতো অস্বস্তিটা ঠিক ফিরে আসে। অফিসপাড়ায় ঘোরাঘুরি করে ডালহৌসী স্কোয়ারে গিয়ে শুয়ে থেকেই—কলাবতীফুলের লাল ছোপ, বিদেশী

ব্যাঙ্কের লাল সোনালী লালে মেশানো পতাকা, আঙুলের মতো উঁচনো জাহাজের হলদে মাস্তুল, ভিজেমাটির আঁশটে জলজ গন্ধ, শামুকের খোল, মাটিতে পড়ে থাকা পাথরের কুচি, কুটো, কাঠি আর দুপুরের সূর্য, আর ট্রামের অর্থহীন ঘুরে ঘুরে যাওয়া দেখতে দেখতে সময় কেটে যেত। তারপর বাড়ি ফিরত ট্রামের বাসের শব্দে বিষণ্ণ হয়ে, ভীড়ের ধাক্কায় ক্লান্ত হয়ে। কিন্তু মিছিমিছি হয়রান। কাজের বেলায় কিছু হয় না অথচ পয়সা নষ্ট হয় বলে মীরা আর এখন পয়সা দেয় না। আর ওরকম নাছোড় ঘোরাঘুরি করতেও চায় না বিনোদ। কী হবে? চাকরি হবে না এটা প্রায় সে একরকম ধরে নিয়েছে। বাড়ির সকলেও তাই।

মীরা ইশকুলে কাজ করে, সেলাই শেখায়। বিনোদের আর লজ্জা করে না, আগে করত, এখন অভ্যেস হয়ে গেছে। শুধু যখন নীলা ছাড়া সকলেই দুপুরের আগে বেরিয়ে যায় অফিসে অথবা ইশকুলে, তখনই অস্বস্তিটা আস্তে আস্তে ফিরে আসে, অন্ধকারে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো দোল খায় চতুর্দিকে। সারা ঘরটা তারপর তাকিয়ে থাকে তার দিকে।

বিনোদও চোখ ফেরাতে পারে না।

ছায়া আর ঘষা স্ফটিকের মতো আলো মিলে ঘরের জিনিসপত্তরগুলোর চেহারা তখন অপরিচিত গঠনের বলে মনে হয়। ঘরে একটা কমলা রঙের শাড়ি শুকোচ্ছিল। শাড়িটা নীলার। নীলা এখন বোধহয় ওঘরে শুয়ে আছে। জল খেতে ইচ্ছে করছিল, একবার ডাকলে হত। এ ঘরে কুঁজো নেই। কিন্তু তক্তাপোশ ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করল না বিনোদের। থাক, সে ভাবল, না হয় পরে খাব। কদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে। এখন বৃষ্টি হলে বেশ হত। হয়তো এখন মেঘও করেছে বাইরে, ঘরের মধ্যে গরম লাগছে। কিন্তু জানালাগুলো বন্ধ। খুলতে ইচ্ছে করছে না।

ঘরের মধ্যে জিনিসপত্তরের হাট, ছড়ানো, ছত্রাকার করা। বিনোদের প্রায় বুকসমান—আলনার পাশে বইয়ের তাক উপচে পড়েছে। নীচে খবরের কাগজের স্তূপ। সেই স্তূপ প্রায় তাকে এসে ঠেকেছে। তাক থেকে কিছুদূরে মালপত্তরের স্তূপ। কাঠের একটা মস্ত তোরঙ্গ, তার ওপর বিছানাপত্তর ডাঁই করা। তার পাশেই আবার আরেকচোট ট্রাঙ্ক আর স্যুটকেশের গাদা। একটা সেলাই রকমের কাঁথা ঢাকনি হিসেবে পাতা। ওই কাঁথাটা মীরার ঠাকুমার হাতের তৈরি। আরেকটু ডানদিকে দেওয়ালের গায়ে পেরেক পুঁতে তার

ওপর তিনটে কাঠের তক্তা পর পর দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে তাক তৈরি করা হয়েছে—এসব ব্যাপারের কারিগরী বিদ্যে অবশ্য মীরার বাবার। সারা বাড়িতে জামাকাপড় শুকোনোর তার টাঙানো থেকে শুরু করে বালতি মগ ভেঙ্গে গেলে পিচ অথবা ধুপ লাগিয়ে ফুটাফাটা বন্ধ করে দেওয়া, বিচিত্র বিচিত্র আকারের তক্তা দিয়ে বাক্স তৈরি করা, টবে তুলসী কিংবা ফুলের চারা লাগানো, চৌকী কিংবা জানালা দরজার কোথাও জখম হলে কাঠের অথবা টিনের পটি মেরে সারাই করা, উঠোন সাফ করা—যাবতীয় কাজে উনি বিশেষজ্ঞ বিশেষ। মেরামতী কাজের জন্য কিংবা ভবিষ্যতে কোনও কাজে লাগতে পারে বলে সবসময়েই পুরনো এবং অকেজো বলে ফেলে দেওয়া পেরেক, টিনের পাত, দড়ি, টিনের কৌটো কাঠের বাক্সটায় মজুত করে রাখেন। তিনটে তাকের ওপর ছোট বড় নানান আকারের রাজ্যের টিনের কৌটো, শিশি, আয়না, চিরুনি, পানের বাটা সাজানো। কাঠের বাক্সটার ঠিক সামনে দেওয়ালের গায়ে একটা কুলুঙ্গী ; তার মধ্যে কালোর ওপর সোনালী কাজ করা জগন্নাথের পট, পাটল রঙের শাঁখ, বেগুনী রঙের মস্ত একটা কড়ি, লাল কাপড়ের গায়ে হেলান দিয়ে সাজানো পেতলের কয়েকটা মূর্তি। সমস্ত ঠাকুরের মাথায় সিঁদুরের গলা দাগ, সামনে ছোট ছোট থালায় বাতাসা দেওয়া। পিঁপড়েয় সমস্তক্ষণ সেইজন্য জায়গাটা ভরে আছে। এঘরে বড় পিঁপড়ের উৎপাত। পিঁপড়ে দেখলে মেরে ফেলা বিনোদের অভ্যাস। কিংবা আঙ্গুল কাছে এনে ভয় দেখানো–এটি তার ছোট বেলার স্বভাব। পোকামাকড় যেমন সে ভালোবাসত, তেমনি আবার মারত। ধুপদানী, প্রদীপদানী, একটা সরষের তেলের শিশি, সিঁদুরের কৌটো, চন্দনের পাটা, মাছের মতো দেখতে তামার কোশাকুশি, সমস্তক্ষণই জায়গাটা থেকে মিষ্টি আর পচা গন্ধ উঠছে। কালকে বাসে করে, কত নম্বর বাস? 33 CHETLA লাল রঙে লেখা? না, কালো। কুচ্ছিত চামড়ার গন্ধ রেল লাইনের পাশে। কী করে থাকে আশেপাশের লোক? বাসে কোনও লোকের মুখই মনে পড়ছে না, শুধু মনে আছে ড্রাইভারটা গীয়ার পালটানোর সময়ে ঘড় ঘড় করে বিশ্রী আওয়াজ হচ্ছিল। কুলুঙ্গী ছাড়া এরপর রয়েছে জামাকাপড় ঝোলানোর একটা র‍্যাক, কলেজ স্ট্রীটে এগুলো বিক্রি করে, আজকাল কলেজ স্কোয়ারে কী ভীড়। আর ফুটপাথে জামাকাপড়ের হকারদের জন্য চলবার যো নেই। মাঝে মাঝে

পুলিশে ধরে নিয়ে যায় গাড়িতে চাপিয়ে, কিন্তু লোকগুলোই বা কোথায় যাবে? বাচ্চাদের প্যাণ্ট, আর মেয়েদের জামায় ঠাসা দোকানকটা, সেদিন মীরার জন্য ব্লাউজ কিনতে গিয়েছিলাম, দোকানে কী বিশ্রীভাবে মেয়েদের বডিস সাজানো, দর্জিগুলো নেহাতই বজ্জাত, রাস্তার ছোঁড়া অথবা বাচ্চা বাচ্চা মেয়েগুলোই বা কম কী, নাঃ, দিনকাল ক্রমে খারাপ হচ্ছে, উঃ গতবছর কী রকম গুলি চলল শ্যামবাজারে, তিনদিন পাঁচমাথার মোড় দিয়ে কেউ হাঁটেনি, ঠিক এই সময়টাতেই আবার ব্যবসাটা গেল। উঃ মীরার সঙ্গে কদ্দিন শুইনি! দেওয়ালে অনেকগুলো ছবি টাঙ্গানো, একটা আছে ওদের দুজনকার বিয়ের পরে তোলা, আর সব নানা রকমের ছবি, উপরদিকে মাথা তোলা শিয়ালের, জড়াজড়ি করে থাকা রাধাকৃষ্ণের, কাপড়ের উপর 'পতি পরম গুরু' সুতো দিয়ে লেখা, গান্ধীজীর, দুটো পাখির। ঘরের মধ্যে যেটা সবচেয়ে বেমানান সেটা হল খয়েরী রঙের একটা পুরনো অরগ্যান। ওটা মীরার মা নাকি তাঁর বিয়ের সময় পেয়েছিলেন বাপের বাড়ি থেকে। উনি নাকি বেশ বড়লোকের মেয়ে ছিলেন, যখন মারা যান—আর মীরার বাবা তার তুলনায়, আর মীরা? অরগ্যানটা নির্জীব জানো-য়ারের মতো পড়ে আছে, মাঝে মাঝে নীলা কিংবা শ্যামল বসে। শ্যামলই বেশির ভাগ বাজায়, ও এককালে পঙ্কজ মল্লিকের রেডিওর দলে ছিল, বি. এস. সি, পাশ করে লোয়ার ডিভিসন কেরানী, কিন্তু বড্ড বেশি কথা বলে আর বাপের কারিগরী বিদ্যের কিছুটা পেয়েছে। আঙ্গুল মটকানোর মতো শব্দ করে একটা আরশোলা দেওয়াল থেকে লাফিয়ে খাটের ওপর পড়ে স্থির হয়ে বসে রইল। আবার জলতেষ্টা পেয়েছে, কী করি? নীলা পাশের ঘরে শুয়ে আছে। ডাকব? যদি কিছু মনে করে। কেন মনে করবে? কেন? আমার তো জলতেষ্টা পেয়েছে।

আস্তে আস্তে বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে পাশের ঘরের দরজা ঠেলল বিনোদ। দরজা ভেজানো ছিল, ঠেলতেই খুলে গেল। মিণ্টু আর নীলা ঘুমিয়েছিল। নীলার বুকে মাথা গুঁজে ঘুমোচ্ছিল মিণ্টু। তার মাথাটা একহাত দিয়ে বুকের উপর চেপে ধরে নীলা শুয়ে আছে।

বিনোদ পিছিয়ে এল।

নীলার মাথার কাছে কুঁজো। নীলার রঙ ফর্সা। একটা বড় তিল তার গলার নীচে দেখবার জন্য ঝুঁকে পড়ল বিনোদ, কিন্তু আসলে তিলটা

অনেক ছোট। এরকম একটা মীরার বুকেও আছে। আগে আগে মীরা—কিন্তু ভয় করছিল বিনোদের, মীরা যদি এখন এসে পড়ে, নীলা যদি এখন জেগে ওঠে, আর যদি তাকে দেখে। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে আসছিল, তবু ঘর থেকে বেরিয়ে এল সে। এসে ফের নিজের তক্তাপোশের ওপর বসল। নীলা কলেজে আই. এ. পড়ে, অথচ আজ, আমি—ইস্, হঠাৎ বিনোদের মনে দুঃখ হল, যদি আই. এ.-টা পাশ করতাম। পরীক্ষাই দিইনি, দিলাম না বিজয়ের পাল্লায় পড়ে। বিজয় সোম, মাথার চুল পেছন দিকে টানা, গোল মুখ, এখন নাকি কনট্রাক্টরী করে। আগের কোনও লোকেরই তো এখন খোঁজ রাখি না, অথচ বিজয় এককালে—আচ্ছা বিজয়ের সঙ্গে যদি নীলার। উঃ নীলা! আচ্ছা নীলার এভাবে শুয়ে থাকার কী মানে? মিণ্টুর আঙুলগুলো ভীষণ ছোট ছোট, আর—নিজের আঙুলের দিকে তাকাল বিনোদ। "নীলা—"। দরজায় কড়া নড়ে উঠল জোরে। বিনোদ দরজা খুলে দিল, মীরা ঘরে ঢুকল। বাসি, মরা মাছের মতো চুপসনো লাগছে তার মুখটা, ঘরে ঢুকেই বলল, "যা মেঘ করেছে, এক্ষুনি বৃষ্টি আসবে। বাইরে কাপড়চোপড় আছে নাকি?"

"কী জানি?"

"ঘুমুচ্ছিলে নাকি?"

"হুঁ।"

মুখ নীচু করে বলল বিনোদ, মীরা চলে গেল ভেতরে। বিনোদ ফের চৌকীতে এসে বসল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাইরে বৃষ্টির চড়চড় আওয়াজ ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠল। দরজা খোলা; জোরে বৃষ্টি নামছে। নামুক। জলের তোড় ছুটছে নর্দমা দিয়ে, ঘড়ির শব্দ ডুবে যাচ্ছে বৃষ্টির আওয়াজে। চারিদিকে যেন অগুনতি ছোট ছোট কাঁচের সাদা ফেটেপড়া ফুল, ফোয়ারার মুখ থেকে জল ঝরে পড়ার মতো শব্দ; বৃষ্টির মধ্য থেকে উঠে এসে বিনোদের সামনে মূর্তির মতো দেখতে দেবদারু গাছটা দাঁড়াল, সে চিনতে পারল, ছোটবেলায় পাড়ার সরস্বতী পূজায় পাতা কেটে গেট সাজিয়েছে তারা, বৃষ্টির আওয়াজ তার মাথার মধ্যে আলতো আঙুলের টোকা মারতে লাগল যেন, বিনোদ শুনল, 'কেন?…কেন?…কেন?' আপন মনেই সে বলল, কেন মীরাকে মিথ্যা কথা বললাম? কেন নীলা শুয়েছিল? কেন মিণ্টুর আঙুলগুলো ছোট ছোট? নিজের মনেই বিড়বিড় করতে লাগল

সে, ভাবল তার কথা বৃষ্টিতে ডুবে যাবে। কিন্তু পেছনে হাসির শব্দ শুনে ফিরে তাকিয়ে দেখল নীলা, "ছোড়দি জিজ্ঞেস করছে চা খাবেন?"

ভুরু কুঁচকে নীলাকে দেখতে দেখতে ঘাড় নেড়ে বিনোদ বলল, "হুঁ।" নীলা আবার হাসল, "দরজাটা বন্ধ করে দিন, জলের ছাট আসছে।" বলে পেছন ফিরল। অভ্যেস মতো বিনোদ পেছন থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতে লাগল ওকে। তারপর উঠে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

নীলার কোমর চাপা, পিঠটা ছড়ানো, পিঠের ঢালটা সুন্দর। আর সেই তিলটা—কিন্তু, এমন করে ও শুলো কেন? মীরা কেমন করে শুতো? অনেক দিন মীরার পাশে শুইনি। দরজার ওপরকার ফাঁকে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো অদ্ভুত একটা সাদা আলোর মধ্যে পোকার মতো নড়ছে, কী করব? অরগানটা পোষা জানোয়ারের মতো দাঁড়িয়ে, আলনায় জামাকাপড়, সাদা একটা পাঞ্জাবি, কতকগুলো শাড়ি, একটা সার্ট, আর মস্তবড় দিল্লীর দরবারের ছবিটা, আমাদের ইস্কুলের হলঘরটা এতবড় ছিল যে ওখানে একটা দরবার বসতে পারত, আর বসতও নাকি তাই, ওটা তো মহারাজার বাড়ি ছিল আগে, পরে ইস্কুল হয়েছে, সিংহের ঝোলানো সাদা কেশরের মতো থামের উপরকার গড়ন, ইস্কুলের মাথায় ইংলণ্ডের রাজার একটা লোহার মুকুট ছিল, সেটা একদিন রাত্রিবেলায় কারা যেন খুলে নিয়ে গিয়েছিল, পুলিশে পুলিশে ছেয়ে গিয়েছিল—আবার সেই দেবদারু গাছটা এসে দাঁড়াল, এতক্ষণ তার কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিল বিনোদ। এবারে তাকিয়ে দেখল পাতায় পাতায় ছেয়ে গেছে চারিদিকে, নীলা এসে ঘরে ঢুকল, তার শাড়, চুল, মুখ পাতায় ভরে গেছে, সবুজ লাগছে চুলগুলো, মুখটা, চিবুক, সব।

"নিন আপনার চা", ঠক করে শব্দ হল, বাটি নামিয়ে রাখল নীলা, বিনোদ তাকিয়ে দেখল চা-এর সঙ্গে বাটিতে আবার মুড়ি আর পাঁপর ভাজা। নীলা একটু নীচু হয়ে ঝুঁকে পড়তেই আঁচলটা ঝুলে পড়ল, বাটিটা বিনোদের হাতে দিল সে, "নিন", বিনোদ দেখল অনেকগুলো দেবদারুর পাতা ছোট-খাটো একটা ঝোপের মতো নীলার পিঠের ওপর থেকে কাঁধ বেয়ে গলার কণ্ঠা বাঁকে পাক খেয়ে খেয়ে গোছা গোছা হয়ে ঘিরে আছে, আশ্চর্য, নীলার একটুও তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই, বিনোদ ভাবল একবার বলে, কিন্তু পরক্ষণেই শুনল সে বলছে, "এখনই, এত শীগগির…কী করে এত সব হল?"

"ছোড়দিকে জিজ্ঞেস করুন।"

"তোমার ছোড়দি কোথায় ?"

"আসছে।" তারপর বিনোদের চোখ লক্ষ্য করে আঁচলটা টেনে ঠি করল। কিন্তু তাতে শরীরটা আরও স্পষ্ট হল, বিনোদ ভাবল এবার বা কিন্তু ঠোঁট চেপে তাকাল নীলা, "দুপুরে ঘুমিয়েছেন ?"

"তুমি ?"

"আমি ?" আঙুল দিয়ে চৌকির ওপর নীলা আস্তে টোকা মারল, "আ আপনার মতো ঘুমোই না।"

"তাই নাকি ?" বিনোদ ফের অন্যমনস্ক হয়ে গেল, নীলা কী বলল, মী ঠোঁট চেপে কী বলল ? মীরা ঘরে ঢুকল। তারপরেই ওপর থেকে কা শব্দ এল, "উঃ কী অসভ্য ছেলে দেখেছ, ঠিক টের পেয়েছে।"

"ওর জন্য রাখোনি ?" নীলা জিজ্ঞেস করল।

"না রাখলে টিকতে দেবে ?" মীরা বলল।

তাড়াতাড়ি নীলা চলে গেল। মীরা বলল, "উঃ, অই ছেলেকে নী না থাকলে কে যে সামলাত", তারপর বলল "চিনি হয়েছে ?" "হাঁ বিনোদ ঘাড় নাড়ল, "কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এসব—" মীরা একটু হাস ওর নাকের নীচে একটা তিল আছে, সেটা নড়ে উঠল, "আজ এমন বৃষ্টি এল-

"তা ঠিক।"

বিনোদ কান পেতে কিছুক্ষণ বাইরের বৃষ্টির শব্দ শুনল। দেব গাছটা সামনে সোজা দাঁড়িয়েছিল পাথরের মূর্তির মতো, মাকড়শার জা মতো সরু সরু রুপোলি জলের রেখায় ভরে গিয়েছিল পাতা, "কেমন শ শব্দ হচ্ছে বাইরে।"

"এস লুডো খেলি," হঠাৎ বলল মীরা। এমন সময় মিণ্টুকে নি নীলা ঘরে ঢুকল।

"নীলা লুডো খেলবি ?"

কোল থেকে মিণ্টুকে নামিয়ে দিল নীলা, তারপর বলল "না, বৃ বৃষ্টির দিনে তাস ভালো লাগে।" বিনোদ পেছন দিকের জানালা খুলে "বৃষ্টি অনেক ধরে এসেছে।"

"তাহলে জানালাটা খোলা থাক।" মীরা বলল। বিনোদ দে বাইরের বৃষ্টির মিহি রেখা সুতোর মতো ঝরছে, ধূসর আলোয় ভরে গেছে ওপরকার আকাশটা, মীরার বাবার লাগানো কাঁঠাল গাছটার ভিজে

বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, শাড়ি শুকোনোর তারটার গা থেকে ঝুলছে সারি সারি ঝকঝকে চোখের জলের মতো বৃষ্টির ফোঁটা। জানালা থেকে সরে এল সে, তারপর তিনজন মুখোমুখি তাস নিয়ে বসল। মিণ্টু নীলার গলা জড়িয়ে ধরে পিঠের ওপর দোল খেতে লাগল, "আঃ ছাড় ছাড়," নীলা পেছনে হাত দিয়ে সরিয়ে দিল মিণ্টুকে, "এখন বিরক্ত করে না।" তারপর ওকে আস্তে একটা চুমো খেল, "আমরা খেলছি, তোর ছবির বইটা নিয়ে তুই খেলগে।" মিণ্টু চলে গেল খাটের নীচে। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে বের করে আনল ওর সেই বিখ্যাত ছবির বই, জন্মদিনে মীরা দিয়েছিল। বই নিয়ে ছবি দেখতে শুরু করল মিণ্টু, গোঁফওলা ইঁদুর, দস্তানা, ব্যাঙ, টিয়া পাখি, মাছ আর লালরঙের চাকাওলা রেলগাড়ি। খেলতে খেলতে বৃষ্টি থেমে এল। তারপর একসময় বৃষ্টি একেবারে থেমে গেলে খেলা ছেড়ে উঠে পড়ল ওরা। বিনোদ বেরিয়ে এল বাইরে গলিতে। চারিদিকে ভিজে, ভীষণ ভিজে। ঘরদোর, জানালা দরজার কাঠ, দেওয়াল ভিজে থকথকে, পীচের রাস্তা ভিজে চকচক করছে চোখের তারার মতো। হাওয়াটাও ভিজে, ঠাণ্ডা। আকাশ সাদাটে হয়ে গেছে, মাঝে মাঝে মেঘের কালো গর্ত— কেমন অদ্ভুত রহস্যময়। বিনোদ ঘরে এসে শার্ট গায়ে দিল। তারপর মীরাকে বলল, "তোমার কাছে খুচরো আছে ?"

"কেন ?"

"একটু বাইরে যাব।"

"এই বৃষ্টির মধ্যে ?"

"কেমন জল জমেছে রাস্তায় দেখে আসি।"

মীরা একটু অবাক হয়ে তাকাল, তাকিয়ে হাসল। বিনোদ বুঝতে পারল, বলল, "হাসছ যে ?"

"এমনি।" মীরা ঠোঁট চেপে হাসল, ওদের দু বোনেরই ঠোঁট চেপে হাসা অভ্যেস। মীরা ঘরে গিয়ে একটা আট আনি এনে দিল, তারপর বলল, "ছাতা নিয়ে গেলে পারতে।"

"এখন তো বৃষ্টি হচ্ছে না।"

"বেশি জলটল লাগিয়ো না আবার, ঠাণ্ডা লাগলে—"

বিনোদ রাস্তায় নামল। পাড়ার গলির মুখে জল, ডাস্টবিন থেকে শালপাতা, ন্যাকড়া আর খবরের কাগজের আবর্জনা ঝুলে পড়েছে জলে,

নোংরা দুর্গন্ধ ভাসছে চারিদিকে, পাশের খাটালটা থেকে তেলতেলে হলদে রঙের জল রাস্তার মধ্যে এসে মিশেছে, পায়ের নীচে ঠাণ্ডায় শিরশির করে, মনে হয় পায়ের তলায় এক্ষুনি কোনও পেরেক অথবা কাঁচের টুকরো ফুটবে, একবার পেরেক ঢুকে গেছিল, মা ভীষণ চটে যেত বৃষ্টির দিন রাস্তায় বেরোলে, আর সেসব দিন—আস্তে আস্তে বড় রাস্তায় এসে পড়ল বিনোদ। পায়ে জুতো পরে নিল। অনর্গল রাস্তা দিয়ে ভিজে গাড়ি চলেছে, জানালা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে কয়েকটা বাচ্চা ছেলেমেয়ে আপন মনে খুশিতে চেঁচামেচি করছিল, পুরনো ধাঁচের নীচু একটা কালোরঙের গাড়ি চলে গেল, হুডগুলো ভিজে চুবচুবে, একটা ছেলে বাইরে মুখ বাড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। দোকানপাটগুলোর টিনের পাল্লা ভিজে আরও কালো দেখাচ্ছে, নীল ডবল ডেকারগুলো ভিজে আরও নীল হয়ে গেছে। চারপাশে টুকরো টুকরো ভীড়, ভিজে জবজবে হয়ে কয়েকটি মেয়ে চলে গেল, ওরা কিন্তু হাসছে, হাতে বই, বোধহয় কলেজে পড়ে। রিক্সাওয়ালারা আপাদমস্তকে ওয়াটারপ্রুফ রিক্সা নিয়ে যাচ্ছে। ট্যাক্সিগুলো দাঁড়াচ্ছে না একটাও। একটা বিড়ি খেলে হত, কিংবা চা। না, চা পরে খাওয়া যাবে, আগে বিড়ি খাই। ফুটপাথে হকারদের মুখ গম্ভীর, কারও জিনিসপত্র ভিজে গেছে, কেউ কেউ জিনিসপত্র সামলাতে গিয়ে নিজে ভিজেছে। একটি ছেলে একটি মেয়ে চলে গেল, মেয়েটার মাথায় ছোট ছাতা তবুও ভিজেছে, ওটুকু ছাতায় দুজনের ধরে না, চুল থেকে জল ঝরছে ছেলেটার, সিগারেট জোরে জোরে টানছে, আর হাসছে। আরেকটু পরে, বাঁয়ে তেলেভাজার দোকান, অনেক লোক লাইন দিয়েছে। পাশেই বাসস্টপ। দোকানের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল বিনোদ, কাঁচের জানলাগুলোর ওপর বৃষ্টির সাদা রেখায় নানা কারুকাজ করা, মনে হয় কোনো দূর দেশের ধনীর প্রাসাদ থেকে খুলে নেওয়া, ডবলডেকারে যেন মানায় না। আসলে জানলাগুলোর জন্য বাসগুলোকে আরও সুন্দর লাগে। পর পর দুটো বাস দাঁড়িয়েছিল, বিনোদ অবাক হয়ে দেখছিল দুটো বাসই দেবদারু গাছে বোঝাই, জানালার কাঁচের ওপর বৃষ্টির রেখাগুলো মাঝে মাঝে ধেবড়ে গেছে পাতার চাপে। কণ্ডাকটার দুজন দাঁড়িয়েছিল, ছোকরা মতন, কাঁধ থেকে চামড়ার ব্যাগ ঝুলছিল, ওদের চুল, দাড়ি, গোঁফ ছেয়ে গেছে পাতায়, কেবল মাথায় … দুলোচ্ছিল ওরা, মাথার ওপর মুকুটের মতো পাতার গোছা। তেলেভাজার

গন্ধে ভরে রয়েছে জায়গাটা। ঠোঙ্গায় ভরে ভীষণ তাড়াহুড়োয় অথচ সাবধানে খদ্দেরদের জিনিস দিচ্ছে লোকটা, পেটটা ভাঁজে ভরা, ঘামে চকচক করছে, বোধহয় উনুনের খুব কাছে বসে রয়েছে বলে।

"এই যে বিনোদবাবু—"

বিনোদ তাকিয়ে দেখল ওদের পাড়ার হারান ঘোষাল, তেলেভাজার লাইনে দাঁড়িয়ে, হাত নেড়ে ডাকছিল, কাছে যেতে বলল, "যা বিষ্টি মশাই, তারপর আপনি এদিকে, কিনবেন বুঝি ?" বিনোদ কী বলবে বুঝতে পারল না, তবু ঘাড় নাড়ল।

"তাহলে আসুন, আমার সামনে জায়গা করে দিচ্ছি—" উদারভাবে হাসল হারাধন, কিন্তু পেছনের ঠোঁটফোলা এক ছোকরা বলে উঠল "বড়দা, বাইরে থেকে লোক আমদানি হবে না বলে দিলুম।"

"আরে আমার নিজের লোক, বাইরের হল ?"

"শ্বশুরবাড়ির লোক মাইরি", আরেকটা পায়জামা পরা ছেলে জামার কলারের নীচে কালো একটা রুমাল ঢোকাতে ঢোকাতে বলল। পাশে একটা কণ্ডাক্টর আর একটা আধবুড়ো লোক দাঁড়িয়েছিল, তারা হাসছিল শব্দ না করে। হারাধন সেদিকে তাকিয়ে বলল, "থাক তাহলে বিনোদ-বাবু, আপনি পরেই লাইন দিন।" বিনোদ কী বলবে ঠিক করতে পারার আগেই দেখল সামনের ডবলডেকারটা ছাড়ছে, দেবদারুগাছে বোঝাই, ডাল, পাতায় জানালাগুলো ছাওয়া, কিছু কিছু বাইরে বেরিয়েছিল, ঝুলছিল। "কাণ্ড দেখেছেন" হারাধন আবার বলল, "এই ষ্টেট ট্রানসপোর্টের বাসগুলো গাছ নিয়ে যাচ্ছে আজকাল।" বিনোদ জানত, কাজেই আস্তে আস্তে বলল, 'অনেকদিন থেকেই তো নেয়।" তারপর একেবারে শেষে গিয়ে লাইন দিল।

পুস্তক পরিচয়

ভারতে ধনতান্ত্রিক বিকাশের ভূমিকা ॥ প্রিয়তোষ মৈত্রেয়। র[illegible]সাগর গ্রন্থমালা—৯। পরিবেশক : গ্রন্থজগৎ। চার টাকা॥

সংখ্যা বিজ্ঞানের অ আ ক খ ॥ রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। রত্নসাগর গ্রন্থমালা—২০। পরিবেশক : গ্রন্থজগৎ। চারটাকা॥

ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস, বিশেষ করে ব্রিটিশ যুগের প্রাক্কাল বা ওই যুগের সময়কার, এমনকি ইংরেজীতেও বিশেষ আলোচিত হয়নি। ১৯০২ এবং ১৯০৪ সালে রমেশচন্দ্র দত্তর বহুল প্রচারিত বই দুখানিতেই এই বিষয়ে প্রথম আলোচনা হয় ইংরেজীতে। রমেশচন্দ্র দত্ত যদিও হারকিউলিসীয় কাজে উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং তাতে বহুল পরিমাণে সার্থকতা লাভ করেছিলেন তবু একথা স্বীকার করতে হবে যে ইতিহাস অনুশীলনে সমকালীন সীমাবদ্ধতাজনিত শত ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে তাঁর বই দুখানি মুক্ত নয়। আর তাছাড়া সে ইতিহাসও ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত ১ম খণ্ডে এবং ১৮৩৭ সাল থেকে ১৯০১ সাল পর্য্যন্ত ২য় খণ্ডে বিবৃত হয়েছে অর্থাৎ সেই ইতিহাসকে আমরা ভারতের পূর্ণাঙ্গ আর্থিক ইতিহাস বলতে পারি না। বাংলায় সেই আর্থিক ইতিহাস লেখার চেষ্টাও খুব কম করা হয়েছে বলা চলে। প্রিয়তোষবাবুর বইখানি ছাড়া বিনয় ঘোষ মহাশয়ের 'বাংলার নবজাগৃতি' ১ম খণ্ড ইত্যাদি আর একখানি বা দুখানি বইয়ের নাম করতে পারি। এ ছাড়াও সেই আর্থিক ইতিহাস যদি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে লিখিত হয় বা লিখিত হবার চেষ্টা দেখা যায় তা স্বভাবতই প্রশংসাযোগ্য ; এই দিক থেকে প্রিয়তোষবাবুর বইখানির আমরা প্রশংসা করতে পারি।

প্রিয়তোষবাবুর আলোচনার সময়কাল ১৭৫৭ সাল থেকে সিপাহী-বিদ্রোহের আগে পর্যন্ত ধরা যায় বোধহয়, যদিও তিনি আর্থিক রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে সিপাহী-বিদ্রোহের কারণগুলির সম্পর্কে সম্পূর্ণই নীরব। বইটিতে অর্থনৈতিক ভূমির (Basis) আলোচনার সঙ্গে মানসিক জীবনের

(রামমোহন ও বিদ্যাসাগর-আলোচনার মাধ্যমে) সম্বন্ধেরও আলোচনা আছে। তবে সেই মানসিক জীবনের (Superstructure) আলোচনা সংক্ষিপ্ত এবং যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্বাসযোগ্য হিসাবে উপস্থাপিত হয়নি! প্রিয়তোষবাবুর বইটির ভূমিকায় "বইটিকে উনবিংশ শতাব্দীর ভারতের অর্থনীতিক ইতিহাসও বলা চলে" এই দাবি করা হয়েছে, তাহলেও এই প্রসঙ্গে বলা ভালো যে এ ইতিহাসকে ১৭৫৭ সাল থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্তের ইতিহাস বলা সঙ্গত এবং তাও ঠিক বিভিন্ন কারণে পূর্ণাঙ্গ হতে পারেনি। যদিও লেখক ভূমিকায় ভারতীয় অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনার অসুবিধার কথা উল্লেখ করেছেন, তবুও একথা বলা যায় যে তিনি যদি তাঁর রচনাগুলির খণ্ডিতরূপ দূর করতে পারতেন (যা বিভিন্ন কালে বিভিন্নস্থানে প্রকাশের ফলেই হয়ে থাকবে) তাহলে তাঁর সংগৃহীত তথ্যও একটা অখণ্ড রূপ নিতে পারত।

বইটির আলোচ্য বিষয়গুলি হল : ধনতান্ত্রিক বিকাশের অর্থনৈতিক পটভূমি, ইংরেজ আগমনের পরবর্তী কালে ভারতের অর্থনীতিক অবস্থা, ইংরেজ অনুসৃত শাসননীতি ও তার প্রতিক্রিয়া, নূতন অর্থনীতি ও নূতন শ্রেণী, বিদেশে কুলি চালান, সমসাময়িক সমাজ ও রাষ্ট্রীয় মানস।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রিয়তোষবাবুর আলোচনায় ভারতীয় অর্থনীতির সামগ্রিক রূপটি ফুটে ওঠেনি ; সেই জন্যই বোধহয় তিনি মধ্যে মধ্যে কয়েকটি স্ববিরোধী উক্তিও করে ফেলেছেন। প্রথম অধ্যায়ের ['অর্থনৈতিক পটভূমি' (১)] আলোচনায় বলা হয়েছে যে ব্রিটিশ যুগের ঠিক প্রাক্কালে "ভারতবর্ষ যখন তার সামন্তযুগীয় অর্থনীতির অন্তিম সীমায় এবং বণিকতন্ত্রগত মূলধন পরিমাণ ও বিস্তৃতির দিক দিয়ে পরিপুষ্টি লাভ করেছে…" (পৃঃ ১) তখন ইংরেজ তার আগমনে সেই স্বাভাবিক গতিকে খণ্ডিত ও বিকৃত করেছে তার স্বকীয় স্বার্থে। এই উক্তির পরেই তিনি যে তথ্য উপস্থাপিত করেছেন তাতে ভারতীয় 'ফিউডাল সমাজের' সেই অবিচ্ছিন্ন ও অপরিবর্তিত রূপেরই সাক্ষাৎ পেয়েছি। অতএব তাঁর তথ্য অনুযায়ী সেই স্বয়ং সম্পূর্ণ Republic সদৃশ গ্রাম্য সমাজব্যবস্থার "অন্তিম সীমা উপস্থিত" একথা বলা যায় কিনা তা বিবেচ্য। এই 'এশীয় ফিউডাল' ব্যবস্থারও ধ্বংস শুরু হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার প্রকৃতি এবং গতি অনুশীলনে লেখক যথেষ্ট মনোযোগ দেন নি। এই দিক থেকে বর্তমান

কালে লিখিত দুটি প্রবন্ধের উল্লেখ করা যায়। ইরফান হাবিবের প্রবন্ধ দুটির ('Agrarian Causes of the Fall of the Mnghal Empire' —Enquiry No. 2 & 3. এবং 'Banking in Mughal India'—in contributions to Indian Economic History I—Edited by Tapan Roy Chowdhuri) তথ্য সংকলন দেখে মনে হয় ভারতে দেশীয় জমিদারশ্রেণী ও জায়গীরদার-ফৌজদার শ্রেণীর সংঘাতের মধ্য দিয়ে মোগল সাম্রাজ্যের শেষদিকে ভারতীয় 'ফিউডাল ব্যবস্থা'র অন্তিমদশা এগিয়ে আসছিল (হাবিব সাহেবের প্রথম প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য) এবং দেশীয় শেঠ-মহাজনরা অর্থাৎ বণিকশ্রেণী যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ করছিল (হাবিব সাহেবের দ্বিতীয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) এবং মার্কস কথিত দ্বিতীয় পদ্ধতিতে (দ্রষ্টব্য, H. K. Takahashi—Science and Society, Fall, 1952) জাপানের মতো আমাদের দেশেও হয়তো ধনতন্ত্রের বিকাশ স্বাধীনভাবে হতে পারত। প্রিয়তোষবাবু ভারতীয় ফিউডাল সমাজের অন্তিমদশার উল্লেখের কিছু পরে অবশ্য বলেছেন (৫ম পৃঃ), "রাজনৈতিক কিংবা ধর্ম অথবা বাণিজ্যের দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংখ্যক নগরী পরিলক্ষিত হত। সেদিনের গ্রামকেন্দ্রিক জীবনে এই নগরীগুলিই ছিল একমাত্র ছেদ।" 'Science and Society'র পাতায় ফিউডাল ব্যবস্থা থেকে ধনতন্ত্রের উদ্ভব প্রসঙ্গে মরিস ডব, পল স্যুইজি প্রমুখ মার্কসীয় অর্থনীতিবিদদের যে বিতর্ক (১৯৫০ সাল বসন্ত সংখ্যা থেকে ১৯৫৩ সালের শেষ পর্যন্ত) হয়ে গিয়েছিল লেখক তার সদ্ব্যবহার করেননি; তাই এই রকম উক্তির মাধ্যমে নিজেকে ডব-স্যুইজি বিতর্কে তিনি জড়িয়ে ফেলেছেন অথচ তাঁর আসল মতটা কি তা পাঠককে বুঝতে দেননি। হাবিব সাহেবের প্রবন্ধ দুটি প্রসঙ্গের আলোচনায় একটি কথা সভয়ে বলতে চাই: আমাদের ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে এ দেশীয় শেঠ-মহাজনদের ভূমিকা কি ছিল? যদি দেখা যায় যে, তাদের মোটামুটি সক্রিয় সমর্থন ছিল (যা থাকা মোটেই অসম্ভব নয়, বরং কোম্পানীর আমলে এই সব শ্রেণীই বোধহয় সবচেয়ে বেশী বঞ্চিত হয়েছিল) তবে বিপ্লবের নেতৃত্ব ফিউডাল হলেও আমাদের দেশে জাপানের 'মেইজি বিদ্রোহে'র মতো চরিত্র 'সিপাহী-বিদ্রোহ' নিত কিনা তা বিবেচ্য। যোগ্য ঐতিহাসিকেরা যদি এ বিষয়ে আমাদের অবহিত করেন তবে ভারতের ইতিহাস রচনায় একটি বিরাট ফাঁক পূর্ণ হতে পারে।

প্রিয়তোষবাবুর আরেকটি স্ববিরোধী সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা যাক। ব্রিটিশ যুগের ঠিক আগে এ দেশীয় শিল্প সম্বন্ধে উল্লেখ করতে গিয়ে লেখক বলেছেন, "সেদিন শিল্পগুলি হস্তচালিত এবং ক্ষুদ্রায়তনের ভিত্তিতে পরিচালিত হলেও স্থানীয় বাজারের অনেক বেশী উদ্বৃত্ত থাকত…" (পৃঃ ৬৮) অথচ ৪র্থ পৃষ্ঠায় লেখকের বক্তব্য হল: "…উৎপাদনটা সেদিন নিতান্তই কোনরকমে জীবনধারণের উপযোগী পর্যায়ে (Subsistence level) ছিল—তাই উদ্বৃত্ত ছিল না ফলে বাজার গ'ড়ে ওঠা সম্ভব হয়নি।" বাজার সম্পর্কে তাই তাঁর মতটি কি তা জানা সম্ভব নয়। বোধহয় তাঁর বক্তব্য হল: যেহেতু সেদিন চাষবাস ও শিল্পকর্ম "নিতান্তই কোনরকমে জীবনধারণের উপযোগী পর্যায়ে (Subsistence level) ছিল এবং যেহেতু জমিতে আর্থিক খাজনা অনুপস্থিত (এর বিরুদ্ধ মতও অবশ্য পাওয়া যাবে: হাবিব সাহেবের উল্লিখিত দ্বিতীয় প্রবন্ধ বা রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের Indian Land System (Govt. of West Bengal) দ্রষ্টব্য) এবং "সাধারণ কাঁচামাল…হাতের কাছেই মিলত" তাই "তেমন যানবাহনের প্রয়োজন ছিল না" এবং বাজার সংকুচিত ছিল যা উৎপাদন পণ্য উৎপাদনের (Commodity Production) পর্যায়ে উন্নীত হয়নি। যদিও হাবিব সাহেবের ব্যবহৃত মালমসলাগুলি দুষ্প্রাপ্য, লেখক অন্তত শ্রীনরেন্দ্রকুমার সিংহের সংগৃহীত তথ্যের উপরও গুরুত্ব আরোপ করতে পারতেন। শ্রীসিংহের তথ্য উল্লেখ করে বলা যায় অন্তত ব্রিটিশ যুগের ঠিক আগেই কাঁচামালের জন্যও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলগুলির সঙ্গে এমনকি দূরাঞ্চলের সঙ্গেও পারস্পরিক যোগসূত্র ছিল (N. K. Sinha—Economic History of Bengal, Vol I, পৃঃ ৯৪-৯৯ ১ম সংস্করণ)।

ধনতান্ত্রিক বিকাশের পটভূমি হিসাবে লেখক মার্কস কথিত প্রথম পদ্ধতিকেই (অর্থাৎ শিল্পপতিরা বণিকশ্রেণীর উপর আধিপত্য বিস্তার করে ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটাল) বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন অথচ তিনি সে কথা কোথাও স্পষ্ট করে বলেননি। কিন্তু বর্তমান সমালোচকের মতে, ভারতবর্ষের মত অন্যান্য 'এশীয় ফিউডাল' সমাজের দেশের মতোই হয়তো মার্কস কথিত দ্বিতীয় পদ্ধতিতেই ধনতন্ত্র বিকাশের পথ উন্মুক্ত ছিল। অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসন আমাদের দেশে না প্রতিষ্ঠিত হলে আমাদের দেশীয় বণিকেরাই ধনতন্ত্রের প্রবর্তন করত এবং ইতিহাসের বন্ধুর পথে নিজেদের শিল্পপতি হিসাবে

প্রতিষ্ঠিত করতে পারত। এই জটিল বিষয়টি অর্থাৎ ভারতীয় সমাজব্যবস্থার Dialectics যতদিন না স্থিরীকৃত হচ্ছে ততদিন উনবিংশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক ইতিহাস আলোচনা অস্পষ্ট থেকে যেতে বাধ্য। "It is therefore most important to explain the development of productive forces which historically made inevitable the bourgeois movement which abolished the traditional feudal productive relations; and the social forms of existence of industial capital at that time" (Takahashi-র উল্লিখিত প্রবন্ধ) অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর আর্থিক ইতিহাস মোঘল সাম্রাজ্যের অবনতির কাল থেকেই শুরু করা যুক্তিসিদ্ধ। এই রকম সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবের জন্য লেখকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে আমাদের তথাকথিত অনড় গ্রাম্য সমাজ-ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ গতি। ইউরোপের মতো জমিদারশ্রেণী না থাকলেও জমিতে মালিকানার পরিমাণ ক্রমশই বাড়ছিল মনে হয় (রাধাকুমুদ মুখার্জী উল্লিখিত পুস্তকে বিবৃত হয়েছে যে পরবর্তী কালের (১৭৯৩) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অনেক স্বত্বই পূর্বে স্বীকৃত হয়ে গিয়েছিল : "Thus long before British rule, the principle of Permanent Settlement was an established principle and the growth of the land holders as a homogeneous body out of the heterogeneous body of different classes of intermediaries became an accomplished fact" পৃঃ ৩২)। এই সিদ্ধান্তের বিশদ আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। এই সব অস… দেখাবার উদ্দেশ্য হল লেখক সামগ্রিক কাঠামো একটি তৈরি করে উঠ… পারেননি যেখানে এই সব আপাতবিরুদ্ধ অবস্থার ব্যাখ্যা মেলে।

অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে বলা যায়, ইংরেজ অনুসৃত শাসননীতি ও … ফল হিসাবে লেখক দেখিয়েছেন ইংরেজ শক্তি কিভাবে ভারতকে কাঁচা… জোগানদার হিসাবে এবং ব্রিটেনের শিল্পের বাজার হিসাবে তৈরি ক… শাসনযন্ত্রের নাগপাশে এবং শস্তা শিল্পজাতদ্রব্যের অসম প্রতিযোগিতা… লেখক এই প্রসঙ্গে দাদাভাই নওরোজী প্রমুখ এদেশীয় অর্থনীতিবিদ… 'Drainage theory' বা শোষণ তত্ত্বটির উল্লেখ করে অর্থনৈতিক ভিত্তি… ও ধ্যানধারণার ইমারতের সম্পর্ক দেখালে বিষয়টি সুপরিস্ফুট হত। … এই প্রসঙ্গটিই বোধহয় লেখকের সবচেয়ে স্বচ্ছন্দ আলোচনা। তবে এ …

সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব আছে, যথা ব্রিটিশরাজের অন্যান্য নীতির (বিশেষ করে শিক্ষানীতির) উল্লেখ বিশেষ নেই।

সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত হলেও অন্যান্য বিষয়গুলির মোটামুটি ধারাটি আমরা অনুধাবন করতে পারি। এই বইটি সম্পর্কে এত বিস্তারিত আলোচনা করা হল এই কারণে যে এ বইটি আবার নূতন করে কয়েকটি অসমাধিত সমস্যাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। এ জন্য লেখক এবং প্রকাশকও ধন্যবাদার্হ।

দ্বিতীয় পুস্তকটি বিশেষভাবে অভিনন্দনীয়। বাংলায় সংখ্যাবিজ্ঞানের উল্লেখ্য বই একটা ছাড়া অন্য কোনো আছে কি না বর্তমান সমালোচকের তা জানা নেই। সেদিক থেকেও অন্তত রবীন্দ্রনাথ ঘোষ পুরোধার সম্মান পাবেন। অবশ্য এছাড়াও সহজ সাবলীল ভাষায় আঠারটি অধ্যায়ের মাধ্যমে সংখ্যা-বিজ্ঞানের জটিল সংখ্যা ও তত্ত্বগুলির ব্যাখ্যা করে (অবশ্য প্রাথমিক স্তরের আলোচনা হলেও) লেখক সাধারণ পাঠকের অপরিসীম উপকার করেছেন। কারণ বর্তমান অবস্থায় সংখ্যাতত্ত্ব ছাড়া কোনো সিদ্ধান্তই করা যেতে পারে না। তবে লেখক সংখ্যাতত্ত্বের আলোচনা বা তার উদ্ভবের ইতিহাস (লেখকের প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) যদি সমাজ পরিপ্রেক্ষিতে করতেন তবে সাধারণ পাঠকদের কাছে তার আবেদন আরো জোরালো হয়ে উঠত। ল্যান্সেলট হগবেন যখন সংখ্যাবিজ্ঞানকে 'জনকল্যাণের সংখ্যাতত্ত্ব' (Arithmatic of Welfare—Lancelot Hogben in Mathematics for the Million) বলেন তখন তাঁর বিজ্ঞান-আলোচনা কি প্রেক্ষাপটে আলোচিত হবে তা আমরা অনুমান করতে পারি। হগবেনের মতো মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী না থাকলেও লেখক যদি এটুকু স্বীকার করে নিতেন যে সমাজের প্রয়োজনে এ বিজ্ঞানের ক্রমশঃ উদ্ভব হয়েছে তাহলেও তাঁর সংজ্ঞা বা তত্ত্ব আলোচনা আরো মনোরঞ্জক হত। পরিশেষে একটি কথা জানাই, যদিও এই বই মনে হয়, সাধারণ পাঠকদের কথা ভেবেই লিখিত; তবুও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সংখ্যাবিজ্ঞানের আলোচনা এই যুগে করতে বসে 'সম্ভাব্যতা-তত্ত্ব' বা 'Theory of probability'র যদি আলোচনা করা না হয়, তবে সে আলোচনা অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য।

বিমল চক্রবর্তী

সমুদ্রমানুষ ॥ অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। মিত্রালয়। পাঁচটাকা ॥

ভূমিকা করব না, কেননা গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে পরিবেশের বৈচিত্র্য কোনখানে এবং কতদূর পর্যন্ত শিল্পসম্মত তা প্রশস্ত আলোচনার ব্যাপার। তবে একেবারেই এড়িয়ে না গিয়ে আপাতত এটুকু প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে পরিবেশ এবং চরিত্রের মধ্যে সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী করে চিত্রিত করতে পারলেই কথাকারের সিদ্ধি। 'সিদ্ধি' অর্থে আমরা. পাঠকেরা, কাহিনীর সঙ্গে একাত্ম হতে পারি। অন্যথায় বিজ্ঞাপনের ভাষায় সাহিত্যের ভূগোল বাড়ানোর প্রচেষ্টা পণ্ডশ্রম। শ্রীযুক্ত অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'সমুদ্র-মানুষ' উপন্যাসটির আলোচনাকালে এই উক্তিগুলি আরও সুপরিস্ফুট হতে পারবে।

উপন্যাসের প্রথম আরম্ভটি উদ্ধার করা যাক: "শিউলিফুলের মত শুভ্র জ্যোৎস্না। দক্ষিণ-মেরুর বিষণ্ণ বরফে ওর ছায়া থমকে আছে। বায়ুতরঙ্গে কেমন একটা শিষ-দেওয়া শঙ্খচিলের নিথর আওয়াজ।..." একেবারে এমন একটা জায়গায় লেখক আমাদের নিয়ে গেলেন যা কল্পনা এবং রোমান্স-রসকে উদ্দীপিত করতে যথেষ্ট। মেরু প্রদেশের অপরিচিত সমুদ্র আর আকাশ; নিউ প্লাইমাউথ, মাউন্ট অ্যাগমণ্ট, লায়ন রক আর একটি জাহাজ—যেখানে নাবিকের কাজ নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে এসেছে মোবারক আলি। কেন্দ্রীয় চরিত্র এই মোবারক আলিই এবং সমালোচ্য বইখানি তারই জীবনেতিহাস। কাহিনীর পরিবেশের অভিনবত্বে সঙ্গত কারণেই আমরা খুশি হতে পারি যেহেতু বিবর্ণ প্রত্যহের একঘেয়েমী থেকে লেখক প্রায় আমাদের গ্রহান্তরে টেনে নিয়ে গেছেন। লেখকের হাত নিশ্চয়ই সমর্থ। নইলে কি করে এমনিতর পারিপার্শ্বিক উত্তরণ সম্ভব হয়। ভৌগোলিক বর্ণনা, জাহাজী কর্মধারার খুঁটিনাটি বিবরণ (যার জন্য মাঝে মাঝে সংক্ষিপ্ত পাদটীকার প্রয়োজন অনুভব করেছি), ও নানান ভিনদেশী চরিত্রের প্রবর্তনায় শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় একরকম চোখে আঙুল দিয়েই বুঝিয়ে দিয়েছেন যে উপন্যাসটি প্রণয়নে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অনেকখানি কাজ করেছে। এবং সেই অভিজ্ঞতা সঞ্জাত রচনাকে হৃদয়স্পর্শী করার অন্যতম কারণ বলা যেতে পারে ভাষার সরল, অকপট ব্যবহার। এতটুকু কৃত্রিমতা নেই, এমনকি এ রকম সরলতায় ভাষা প্রায়ই শিথিল, প্রসাদগুণবিবর্জিত, অননুশীলিত ঠেকে। আর বইখানিকে যদি একটানে শেষ করা কারুর পক্ষে সম্ভব না হয়—যেমন

আমার ক্ষেত্রে হয়েছে, তবে তার কারণও প্রধানতঃ এই। অবশ্য এক্ষেত্রে বিবেচনা করতে ভুলিনি যে, সাহিত্যক্ষেত্রে শ্রীযুত অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় একেবারেই একটি নতুন নাম। বলা বাহুল্য প্রথমতম রচনায় এই ধরনের অপ্রতিভতা সমালোচনীয় নয়।

পারিপার্শ্বিক বৈচিত্র্য রমনীয়তা অর্জন করলেও শেষকালে আমাদের কিছু অতৃপ্তি থেকেই যায়। আশা করেছিলাম মোবারক আলিকে একজন পুরো সমুদ্র-মানুষ হিসেবেই দেখব (লেখকের অভিপ্রায়, যদি আমি ভুল না বুঝে থাকি, উপন্যাসটির নামের মধ্যে মোবারক আলিকেই প্রচ্ছন্ন করে তোলা); সমুদ্রের উদার, উর্মিল ও বিচিত্র পটভূমিকায় মোবারকের বলিষ্ঠ, সংগ্রামশীল এবং যেহেতু সে ঘর-ছেড়ে-আসা সি-ম্যান, অতএব নাবিকের স্বাভাবিক বিবাগী বৃত্তি সম্পন্ন একটি মানুষ খুঁজতে গিয়ে ব্যর্থ হলাম। ঘর-ছেড়ে-এলেও সে সর্বক্ষণ ঘরের কথাই ভাবে, জাহাজের বুকে তাকে আগাগোড়া দেখতে পেলেও সে ক্বচিৎ আপনার দায়িত্বে সচেতন হয়েছে, তার সমস্ত মনপ্রাণ শামীনগড়ের মাটিতে, স্মৃতিতে সংলগ্ন রয়েছে। একদিকে অতিমাত্রিক স্মৃতিচর্যা, অপরদিকে, বর্তমান বলতে যা, তা নিতান্তই সামান্য। লিলি-ব্লু-নাম্নী জনৈকা মহিলার সঙ্গে তার প্রণয় আর মাউথ অর্গান বাজানো। সুতরাং সমুদ্র-মানুষের বদলে এক অত্যন্ত সাধারণ দুর্বল একটি স্মৃতি ভারাক্রান্ত মানুষের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটল। অর্থাৎ প্রথমে পরিবেশ বৈচিত্র্যে মুগ্ধ করল যে উপন্যাস, পরিশেষে বৈচিত্র্যহীন সাধারণ একটি মানুষের অন্তর্জালার ইতিবৃত্তে সে হতাশ করল আমাদের। তাই, মুগ্ধতাও স্থায়ী হল না শেষ পর্যন্ত। পটভূমির সঙ্গে চরিত্রের সম্পর্কশূন্যতা উপন্যাসটিকে সার্থক হতে দিল না। তাছাড়া কাহিনীর মধ্যে ঘনঘন রেট্রস্পেকসন ক্লান্তিকর এবং সেইজন্যই অনাকর্ষণীয়—শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের তা সম্ভবত অজানা নেই। বর্তমান উপন্যাসের এই ত্রুটি তাঁর পরবর্তী রচনায় দেখা যাবে না আশা করি। কয়েকটি পার্শ্বচরিত্র যেমন রেনৌল, লিলি ব্লু, জসীমুদ্দীন প্রভৃতির পরিস্ফুটন যথাযথ।

আর সমুদ্র মানুষ না হোক, এমনি মানুষ হিসেবে মোবারক আলির যে যন্ত্রণাদীর্ণ, স্মৃতিদগ্ধ চরিত্র শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় সৃষ্টি করেছেন তা নিপুণতার পরিচায়ক। আলোচ্য উপন্যাসে বহু ক্ষেত্রেই তাঁর শিল্পকৃতিত্বের চিহ্ন ছড়িয়ে আছে—এটা নিছক শূন্যগর্ভ উৎসাহ বাক্য বলে তিনি যেন মনে না করেন।

শিবশম্ভু পাল

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

একশ' বছর পরে ॥ সম্পাদক : পঞ্চানন রায়চৌধুরী। 'সাহিত্য
৫৩ গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় লেন, রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া। এক টাকা॥

পঁচিশে বৈশাখে রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত নবীন কবি কাব্য সংকলন। কবির প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে সংকলনের প্রকাশ, তার কাব্যমূল্য বিচারে আপাতত আমরা প্রবৃত্ত হচ্ছি না। রাণা বসু, মণীন্দ্র কর রায়, বিশ্বরঞ্জন দে ও শেখর মজুমদারের কবি উল্লেখ্য।

ঝিনি সুতোর মালা ॥ সমীরকুমার গুপ্ত। সাধারণ পাবলিশা
কলকাতা-১২। এক ন. প.।

লেখক সাম্প্রতিককালের তরুণতম কবিদের অন্যতম। ইতিপূর্বে 'শিশিরবি নামে তাঁর একটি কাব্য সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্র-জন্ম-শত ২৫শে বৈশাখে এই ১৬ পৃষ্ঠার কাব্য সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছে। 'রবী প্রণাম' বা ভূমিকায় কবি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে জানিয়েছেন…"তুমি শতাব্দীর সবচেয়ে ব্যর্থ, বিবর্ণ ও বিপন্ন কবির প্রণতি গ্রহণ কর। সুতোর মালার যে কুঁড়িগুলো কথনো ফুটবে না, তাদের ঝরা নিঃশ্বাসে আ কৃতজ্ঞতা রইলো।"

বিনামূল্যে বিতরণ না করে এই সংকলনটির মূল্য মাত্র এক নয়া পয়সা করায় কবির মানসিকতার একটি বিশেষ দিক স্পষ্ট হয়েছে।

যে কালে—যে দেশে ॥ প্রগতি পাবলিশিং, ডায়মণ্ডহারবা
এক টাকা॥

রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত লেখকের ক্ষুদ্র কাব্যপুস্তিকা।

দুরন্ত দীপ্ত দিগন্ত ॥ খালাসী কবি মুমূর্ষু বাগ সম্পাদিত। প্রাপ্তি
ইউনিভার্সাল বুক ডিপো, কলকাতা ১২। দু টাকা পঁচানব্বই ন. প.।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ ইলেকট্রিক গার্ডেনরীচ শাখার কর্মচারীদের রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত কাব্য সংকলন।

সম্পাদকের লেখা ইতিপূর্বে আমরা পড়িনি। গ্রন্থ সংলগ্ন বিজ্ঞাপন থেকে বোঝা গেল ভবিষ্যতে এঁর খালাসী জীবন নিয়ে একটি 'খণ্ড কাব্য' প্রকাশিত হবে। তাই বোধহয় ইনি 'খালাসী কবি'। আর সংকলনের প্রথম কবিতাটি এঁরই লেখা, নাম 'দুরন্ত দীপ্ত দিগন্ত'। তাই বোধহয় বইয়েরও এই নাম।

বলা বাহুল্য এই ধরণের সংকলনের অধিকাংশ রচনাই দুর্বল হয়। এমন কি প্রকাশ-অযোগ্য রচনার সংখ্যাও কম থাকে না। তথাপি আমরা এই সকল গ্রন্থে নবাগত লেখকদের খুঁজি, কখনও কখনও আবিষ্কারও করি। তাছাড়া রবীন্দ্র-শতবর্ষে শ্রমিকদের উৎসাহে প্রকাশিত এই ধরনের সংকলনের ভিন্ন মূল্য সম্পর্কেও আমরা অবহিত। কিন্তু সম্পাদকের ধৃষ্ট ভূমিকা ও লেখক পরিচিতি প্রথমেই আমাদের এত হতাশ করে যে, তারপর এই সংকলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কেই পাঠকের মনে সন্দেহ না জেগে পারে না।

জাহাজঘাটা ॥ শ্রীশোভাময়। প্রাপ্তিস্থান : বুক হাউস, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা ১২। পঁচাত্তর ন. প.॥

দুই খণ্ডে বিভক্ত পঁচিশটি কবিতার ক্ষুদ্র সংকলন। রচনা সর্বক্ষেত্রে পরিণত না হলেও জীবন-বিশ্বাসী একটি কবি মনের পরিচয় পাঠক মনে আশা-সঞ্চার করে।

ছবি ॥ আশীষ সেনগুপ্ত। চিররঞ্জন সিংহ রায়, বাটানগর, ২৪ পরগণা। পঁচাত্তর ন. প.॥

প্রকাশকের ভূমিকা পাঠে জানা গেল লেখক সাহিত্যে প্রায় সব্যসাচী (যদিচ এইটিই তাঁর প্রথম বই) এবং আলোচ্য ক্ষুদ্র কাব্যসংকলনটি "আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে নূতন আলোকপাত করতে পারবে"।

বর্তমান জীবনের গ্লানি ও সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ লেখকের অধিকাংশ রচনাতেই উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে। শিল্পগুণ ব্যাহত হলেও কবির সুস্থ জীবনাদর্শটি প্রকাশ পেয়েছে সন্দেহ নেই।

হাঁটা এ জীবন ॥ অ. কু. চ.। সুনীতি বুক ডিপো, স্টেশন রোড, সোদপুর, ২৪ পরগণা। এক টাকা॥

ক্রোনোক্রমে ছাপা এই ক্ষুদ্র কাব্য সংকলনটির একটি দুটি কবিতা কবি সম্পর্কে পাঠককে আগ্রহী করবে।

দুঃসহ পাঁচালী ॥ নির্মলকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রাপ্তিস্থান: বিশ্বনা পাবলিশিং হাউস। এক টাকা॥

পাঁচালীর ঢঙে লেখা কয়েকটি পদ্যের সঙ্কলন। লেখক আপন বিশ্বাস মতে নীতিকথা প্রচার করেছেন এবং ভূমিকায় জানিয়েছেন 'কাব্যসাধনা' তাঁর নেশা বা পেশা নয়।

মনোরমা ॥ বিশ্বনাথ কাব্যভারতী। প্রাপ্তিস্থান: বিশ্বনাথ পাবলিশি হাউস, ৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা। পঞ্চাশ ন. প.॥

পেশায় বিড়ি-শ্রমিক। শৈশব থেকে জীবন সংগ্রামের কঠোর দৈনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা একেবারেই নেই। তবু "স্বভাবকবিত্বের" গু বিশ্বনাথ কাব্যভারতীর প্রথম কাব্যপুস্তিকা 'আমাদের গান' একশ্রেণী "পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ" করেছিল। 'মনোরমা' তাঁর দ্বিতীয় কাব্য পুস্তিকা প্রায় দেড়শো পৃষ্ঠার কাহিনীকাব্যকে সংক্ষিপ্তাকারে ছাব্বিশ পৃষ্ঠায় প্রকা করতে হয়েছে। মনোরমা নামে এক উদ্বাস্তু রমণীর জীবনের ব্যর্থতা গ্লানিকে অবলম্বন করে এর আখ্যানভাগ রচিত হয়েছে। সরল, পাঁচালী ঢঙে লেখা। পল্লীকবিতার মাধুর্য কোথাও কোথাও মনকে স্পর্শ করে।

জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী (বাঙ্গালা বিভাগ) : ১৯৫৮ ॥ সম্পাদক : বি. এ কেশবন। স্টেট ব্যুরো অব্ এডুকেশন, শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার পাঁচ টাকা॥

ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কার্য মন্ত্রণালয় ভারতে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী সংকলনে ব্রতী হয়েছেন। সংবিধান তালিকাভুক্ত চো ভাষায় প্রকাশিত নতুন পুস্তকের প্রামাণ্য তালিকা হল এই ভারতীয় জাতী গ্রন্থপঞ্জী। ১৯৫৪ সালে লোকসভায় গৃহীত এবং ১৯৫৬ সালে সংশোধি আইন অনুসারে কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার, মাদ্রাজের কন্নেমারা পাবলি লাইব্রেরী, বোম্বাইয়ের সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী ও নয়াদিল্লীর সেণ্ট্রাল রেফা লাইব্রেরী ভারতে প্রকাশিত সকল প্রকার পুস্তকের একটি করে কপি প্রকাশকদের কাছ থেকে পাওয়ার অধিকারী হয়েছেন। "আইনের মাধ্য ভারতে প্রকাশিত সব বইয়ের একত্রীকরণ এবং প্রতি তিন মাসে এ গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশের প্রচেষ্টা আমাদের ইতিহাসে এই প্রথম। ১৯৫৮ সা

১৫ই অগস্ট প্রকাশিত জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর প্রথম সংখ্যায় ১৯৫৭ সালের অক্টোবর হতে ডিসেম্বর এই তিন মাসে প্রাপ্ত বই তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে। ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশন এবং বছরের শেষে একটি ক্রমচয়িত (cumulated) বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশিত হয়।···কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় প্রতিটি রাজ্য সরকার নিজ নিজ ভাষায় প্রকাশিত সকল বইয়ের এক বার্ষিক গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।"

বর্তমান গ্রন্থটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছে। এর পরবর্তী খণ্ডগুলির জন্য আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করছি।

কজ্জল সেন

আমি সিরাজের বেগম ॥ শ্রীপারাবত। নতুন প্রকাশক, কলকাতা। তিন টাকা॥

ইতিহাসাশ্রিত এই উপন্যাসে শ্রীপারাবত বাংলার একটি বিশেষ যুগকে বিবৃত করতে চেয়েছেন। কিন্তু ভিন্ন দৃষ্টিতে। প্রাসাদের জানলা থেকে, দাসী-বাঁদীর কথায়, পরিবার পরিজনের হাবে-ভাবে বাংলার সংকটময় সময়কে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন লুৎফার জবানবন্দিতে। এইভাবে লুৎফাকে উপস্থিত করা হয়েছে পাঠকের সামনে। দৃষ্টিকোণ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু সমস্ত সংকট এবং তার ভয়াবহতাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যে পরিমাণ শিল্পক্ষমতা থাকার প্রয়োজন ছিল, দুঃখের হলেও সত্য, বর্তমান সমালোচকের দৃষ্টিতে সে ক্ষমতা শ্রীপারাবতের এখনো অনায়ত্ত। লুৎফা চরিত্র হয়ে দাঁড়াতে পারে নি নিজের জোরে। বাইরের প্রবাহ এসে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং তাতে তার প্রতিক্রিয়া হয়েছে। কিন্তু সেই প্রতিক্রিয়া দানা বাঁধতে পারে নি। ইতিহাসের মালমসলা সংগ্রহেও লেখককে অলস বলে মনে হয়। বহুল প্রচলিত কয়েকটি ঘটনার বিবৃতি নিঃসন্দেহে উপন্যাসের মর্যাদা পাবে না। ঘটনা এবং কল্পনার হর-গৌরী মিলনে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সার্থকতা। আলোচ্য উপন্যাস সেই সার্থকতার দিকে পিঠ ফিরিয়ে আছে।

জ্যোতির্ময় বসু

সংস্কৃতি সংবাদ

বিয়োগপঞ্জী

২৬শে আগস্ট অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের জীবনাবসান হয়েছে।

চারুচন্দ্রের জন্ম ১৮৮৩ সালের ২৯শে জুন। ১৮৯৯ সালে মেট্রোপলিট স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স, ১৯০১ সালে মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে এফ, এ, এবং ১৯০৩ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি, এ, (বি কোর্স) পাশ করেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, মিঃ পাসিভাল প্রমুখ বরেণ্য অধ্যাপকদের কাছে শিক্ষালাভের সুযোগ তাঁর হয়েছিল। ১৯০৪ সালে চারুচ পদার্থবিদ্যায় এম, এ, পাশ করেন। প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যা লেকচারার ও কয়েক বছর পরে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক রূপে তিনি শিক্ষাব্র নিযুক্ত থাকেন। ১৯৪০ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করে।

এম, এ, পড়ার সময়ই চারুচন্দ্র আচার্য জগদীশচন্দ্রের অধীনে গবেষণা শু করেন। এম, এ, পাশ করার পরও তাঁর এই গবেষণাকার্য অব্যাহত থাকে।

চারুচন্দ্রের সুদীর্ঘ অধ্যাপক জীবনের চূড়ান্ত সাফল্য তাঁর বিশিষ্ট ছাত্র জীবনে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়েছে। মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ সত্যেন্দ্রনাথ বসু, শিশিরকুমার মিত্র, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, জ্ঞানে মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিকগণ তাঁরই ছাত্র। সেইদিক দি চারুচন্দ্রকে বাঙলাদেশের দুইযুগের বিজ্ঞান সাধনার সেতুরূপে গণ্য করা যা

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চারুচন্দ্রের যোগাযোগ আর এক উল্লেখযোগ্য ঘট ১৯২২ সালে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী প্রকা বিভাগের ভার অর্পণ করলেন চারুচন্দ্রেরই হাতে। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত পরিচালনার দায়িত্ব তিনিই বহন করেছেন। বাংলা পুস্তক প্রকাশ বিশ্বভারতী যে বিপুল ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছেন, তার পেছনে চারুচন্দ্রের অবদা সামান্য নয়। আমৃত্যু তিনি প্রকাশন বিভাগের উপদেষ্টা রূপে নিজে এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত রেখেছিলেন। তাছাড়া প্রথমাবধি বিশ্বভার কার্যনির্বাহক পরিষদের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। দশবৎসর তিনি সম আন্দোলন করেছেন এবং 'ভাণ্ডার' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন।

জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য ও প্রভাবের ফল আ

পেয়েছি চারুচন্দ্রের সাহিত্যে। শুধু বিজ্ঞান সাধনা বা অধ্যাপনা বা কর্ম পরিচালনার দায়িত্বই তিনি পালন করেন নি। বিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্বকে সরল, সুন্দর, রুচিকর ভাষায় প্রকাশ করেছেন, প্রচার করেছেন। অক্ষয় কুমার, রামেন্দ্রসুন্দর, রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্রের মতো চারুচন্দ্রও বাংলাভাষার বিজ্ঞানচর্চার উল্লেখযোগ্য ভূমি প্রস্তুত করে গেছেন। যার সুফল বর্তমানে ক্রমবর্ধমান আকারে আমরা ক্রমশঃ দেখতে পাচ্ছি।

মৃত্যুকালে তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, রবীন্দ্রভারতী, অবনীন্দ্র পরিষদ, ভারতসভা, রামমোহন লাইব্রেরী প্রভৃতি নানা সংস্থার অন্যতম কর্ণধার ছিলেন। 'বসুধারা' নামে একটি মাসিকপত্রও সম্পাদনা করতেন।

৭৮ বছর বয়সে এই বিজ্ঞান তপস্বী, সাহিত্যিক ও কর্মী পুরুষের জীবনাবসানে সকলেই বেদনার্ত। আমরা আশা করি বিশ্বভারতী ও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ চারুচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করবেন।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রপ্রদর্শনী ঃ রামকিঙ্কর

শিল্পী রামকিঙ্করের ছবির ও ভাস্কর্যের প্রদর্শনী কলকাতার কলাজগতে এক অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাঁর মতো অগ্রগণ্য একজন ভাস্কর ও চিত্রকরের এতগুলি রচনা একসঙ্গে এর আগে শান্তিনিকেতনের বাইরে যে কোথাও দেখার বিশেষ সুযোগ পাওয়া যায়নি, সেটা ভাবলে বেশ একটু বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না।

এই প্রদর্শনীতে রামকিঙ্করের গোড়ার দিকের (১৯৩৫) কাজ থেকে শুরু করে প্রায় সমসাময়িক (১৯৫৯) কাল পর্যন্ত অনেকগুলি তেল-রঙ, জল-রঙ, ভাস্কর্য ও কয়েকটি গ্রাফিক কাজ উপস্থিত করা হয়েছে। বীরভূমের রুক্ষ প্রকৃতি, সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের নানা দৈনন্দিনতা, সাঁওতালদের ঘর-গৃহস্থালী, ফসল তোলার কাজ আর কাজের ফাঁকে বিশ্রাম—প্রধানত এই সবই রামকিঙ্করের ছবির বিষয়। এবং, প্রায় প্রত্যেকটি রচনার মধ্যে এমন একটা গতিবেগ আর অস্থির অনুসন্ধিৎসার পরিচয় আছে যা দর্শকের মনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করবেই।

একসঙ্গে এতগুলো ছবি দেখে রামকিঙ্করের রচনার যে বৈশিষ্ট্য আগাগোড়া সবচেয়ে স্পষ্টভাবে চোখে পড়বে, সেটা হল তাঁর প্রাণবন্ততা এবং

ফর্ম সম্বন্ধে নতুন নতুন অনুসন্ধানের প্রয়াস। কিন্তু রামকিঙ্কর কোথাও ফর্মসর্বস্ব নন। তাঁর রচনায় ফর্ম এসেছে রচনাটির সামগ্রিক দেশগত পরিবেশের সঙ্গে সুসমন্বিত হয়ে। এটা সহজেই চোখে পড়ে যখন দেখি প্রধানত মানুষের ফিগার—তার দৈহিক আকৃতিগত ছন্দই—তাঁর ফর্মের মূল ভিত্তি। একেবারে আকার সাদৃশ্যহীন—নন্‌ফিগারেটিভ—বিমূর্ত কর্ম তাঁর কোনো কোনো রচনায় এলেও, সেটা বড় একটা প্রাধান্য পায়নি। এদিক থেকে রামকিঙ্করের রচনা 'মডার্ন' হয়েও যে তার ভারতীয় চরিত্রটুকু অক্ষুণ্ণ রেখেছে, সেটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইওরোপীয় মডার্ন আর্টে সাধারণত ফর্ম তার দেশগত পরিবেশের সঙ্গে একটা বিরোধ সৃষ্টি করে। সেইটেই ইওরোপীয় মডার্ন আর্টের একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু রামকিঙ্কর নন্দলালের ছাত্র হিসেবে ভারতীয় শিল্প ঐতিহ্যের ধারাগুলিকে গভীরভাবে আত্মস্থ করেছেন এবং সেই সঙ্গে ইওরোপীয় মডার্নিস্টদের ভাবধারাগুলিকেও মনোযোগের সঙ্গে অনুশীলন-অনুধাবন করেছেন। তার ফলে তিনি নিজস্ব একটা ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়ে নিজের মতো করেই শিল্পসৃষ্টি করেছেন।

বস্তুর বাস্তবগ্রাহ্য রূপটিই তাঁর রচনায় রয়েছে ধ্রুবপদ হিসেবে। বিশেষত তাঁর জলরঙের স্কেচগুলি, প্রতিকৃতি-ভাস্কর্যগুলি এবং অনেকগুলি তেল-রঙের কাজ যেমন বাস্তবানুগ, তেমনি উজ্জ্বল রঙে আর বলিষ্ঠ তুলির টানে আশ্চর্য রকম প্রাণবন্ত।

সমকালীন শিল্পীদের মধ্যে রামকিঙ্করের মতো শক্তিশালী খুব কমই আছেন। কিন্তু তাঁর রচনাবলী সম্বন্ধে আলোচনাও সেই তুলনায় খুব কমই হয়েছে। তাঁর চেয়ে অনেক কম শক্তিশালী যে-সব শিল্পী শুধু ভঙ্গি দিয়েই মানুষের চোখ ভোলাবার কাজে নেমেছেন, তাঁদের প্রতি যখন আকাদমি থেকে শুরু করে নানা সরকারী-বেসরকারী সূত্রের বহুমুখী করুণাধারা উৎসারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশে-বিদেশে চলেছে উচ্চকিত প্রচারের ঢাক পেটানো, তখন রামকিঙ্কর সম্পর্কে আর্টের দেউড়ির ঐ সব দ্বারপালদের নীরবতায় শুধু এইটেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে পুরোহিতকে প্রণামী না দিলে দেবতার প্রসাদ পাওয়া যায় না। রামকিঙ্কর শান্তিনিকেতনের নিভৃত নীড়ে একান্তভাবে শিল্পসৃষ্টির কাজেই মগ্ন। প্রচার অথবা প্রসাদ—কোনোটির জন্যেই তিনি কারুর কাছে প্রণামী পেশ করতে চাননি।

রবীন্দ্র মজুমদার

হায় স্বাধীনতা!

গত ১৮ই আগস্ট তারিখের 'নিউ স্টেটসম্যান' পত্রে 'ক্রিটিক' তাঁর 'লণ্ডন ডায়েরী'তে লিখেছেন :

"খবর পেলাম, গত ১লা জুলাই উদ্যোক্তারা কমিটি অব সায়েন্স অ্যাণ্ড ফ্রীডম ভেঙে দিয়েছেন। এই কমিটির উদ্যোক্তা ছিলেন কন্‌গ্রেস অব কালচারাল ফ্রীডম। ঘটনার যে বিবরণ আমি পেয়েছি তা এই : এই কমিটির সভাপতি ছিলেন মাইকেল পোলানী এবং সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অটো হান, জাক মারিটেন, রবার্ট ওপেনহাইমার, লর্ড রাসেল ও স্যার জর্জ টমসনের মতো বিখ্যাত ব্যক্তিরা। কমিটি একটি বুলেটিন প্রকাশ করতেন। এটি ৫২টি দেশে প্রধানত অধ্যাপক ও শিক্ষাবিদদের মধ্যে প্রচারিত হত। বুলেটিনটির মেলিং লিস্টে নাম ছিল ৫,৫০০। কমিটি অ্যাপারথিড এবং স্বাধীনতার অন্যান্য সমস্যা নিয়ে আন্দোলন চালিয়েছে। কমিটি আগামী সেপ্টেম্বর মাসে একটি পারমাণবিক আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল। সি. পি. স্নো তাঁর বিতর্কমূলক বক্তৃতা 'আণবিক যুগে বিজ্ঞানীর দায়িত্ব'র ভিত্তিতে আলোচনা চালাবার অনুমতি দিয়েছিলেন। চার জন বিখ্যাত অধ্যাপককে এতে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তাঁরা হলেন পোলানী, জে. ডি. বারনাল, সি. ডি. ডারলিংটন ও জাপানের তাতো কোমাই। পোলানী যখন অন্যান্যদের নাম শুনলেন তখন জানালেন তিনি স্নোর সঙ্গে কোনো আলোচনা সভায় যোগ দেবেন না আর বারনাল যদি যোগ দেন তাহলে পদত্যাগ করবেন। পদত্যাগ তিনি করলেন আর তারপরই তাঁর কন্‌গ্রেস অব কালচারাল ফ্রীডম-এর সহকর্মীরা কমিটিটি ভেঙে দিলেন। বারনাল কমিউনিস্ট আর স্নো-র সঙ্গে মতবিরোধ আছে আলোচনায় যোগ না দেবার এই যুক্তি অদ্ভুত। যে সংগঠন স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন বলে ঘোষণা করে থাকেন—বিভিন্ন মতাবলম্বীদের একটি আলোচনা সভায় যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানানোর অপরাধে তাঁরা তাঁদের অধীনস্থ একটি কমিটিকে ভেঙে দিলেন এটা আরও অদ্ভুত ব্যাপার—বিশেষত আলোচ্য বিষয়টি যখন এমন যা ইংলণ্ড, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্র সব দেশের স্বাধীনতার সমস্যার সঙ্গে জড়িত।"

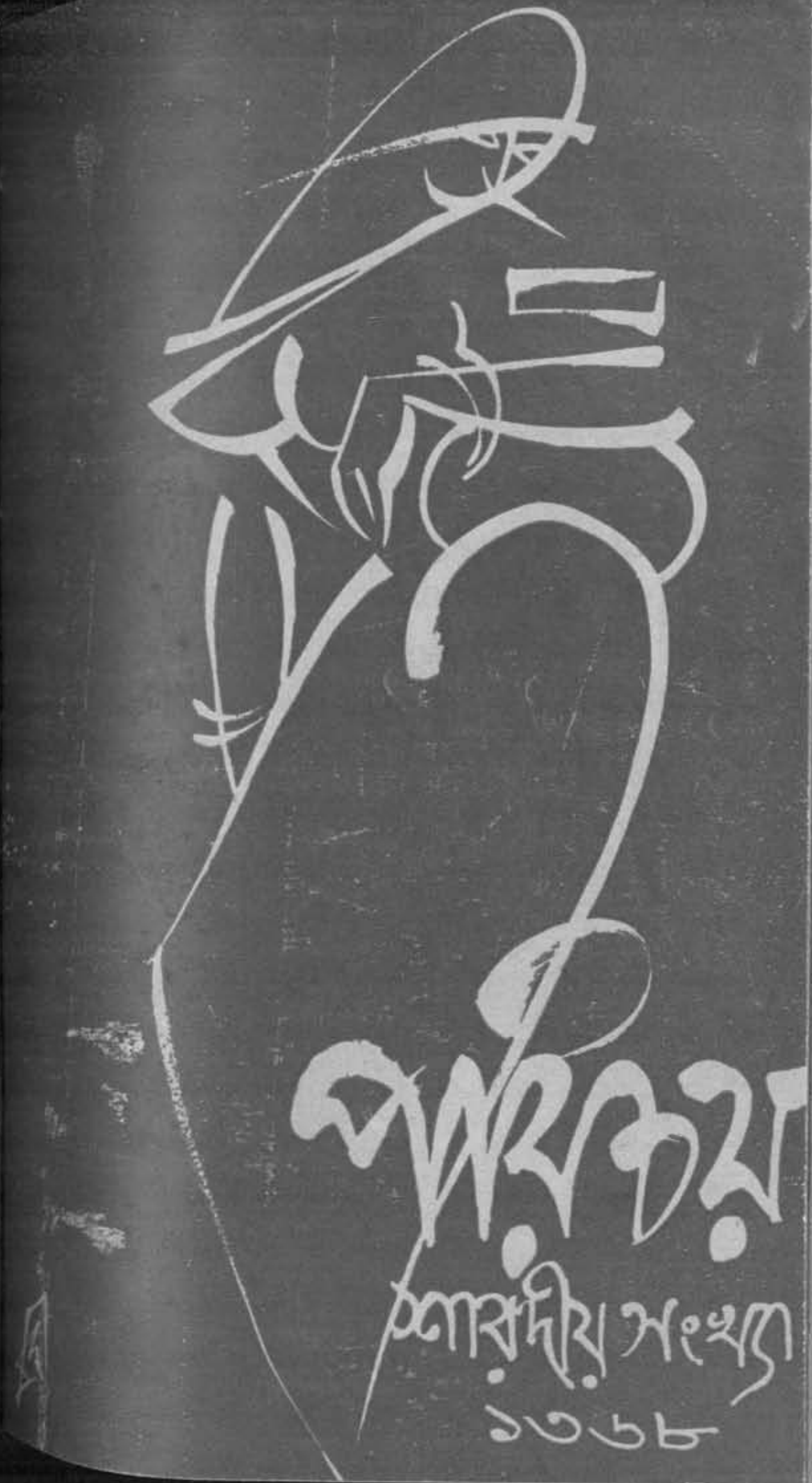
তথাকথিত চিন্তার স্বাধীনতাবাদীদের স্বরূপ 'ক্রিটিক'-এর উপরোক্ত উক্তিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সুতরাং এ-নিয়ে অযথা বাগবিস্তার করব না। আমরা শুধু পাঠকদের মনে করিয়ে দেব : 'নিউ স্টেটসম্যান' পত্রিকা কমিউনিস্ট নন, উদারপন্থী আর 'ক্রিটিক' হচ্ছেন পত্রিকাটির ভূতপূর্ব সম্পাদক কিংসলি মার্টিন।

শচীন বসু

বর্ষসূচী

শ্রাবণ ১৩৬৬—আষাঢ় ১৩৬৭ [১৮৮১—৮২]


আহারের পর
দিনে দু'বার..
সব ঋতুতে
স্বাস্থ্য লাভের
শ্রেষ্ঠ উপায়
সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট
মৃতসঞ্জীবনী
Mritusanjibani
সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা
কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম,বি, বি-এস, আয়ুর্বেদ-আচার্য্য, ৩৬, গোয়াবাগান রোড, কলিকাতা-৩৭
অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ,
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি-এস,
এম,সি,এস (আমেরিকা),
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের
অধ্যাপক।


পরিচয়
শারদীয় সংখ্যা
১৩৬৮